প্রকাশনার ৮০ বছর
সাপ্তাহিক
প্রতিবেশী
সংখ্যা : ৩৯ ❖ ২৫ - ৩১ অক্টোবর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

নাজারেথের কুমারী : মারীয়া

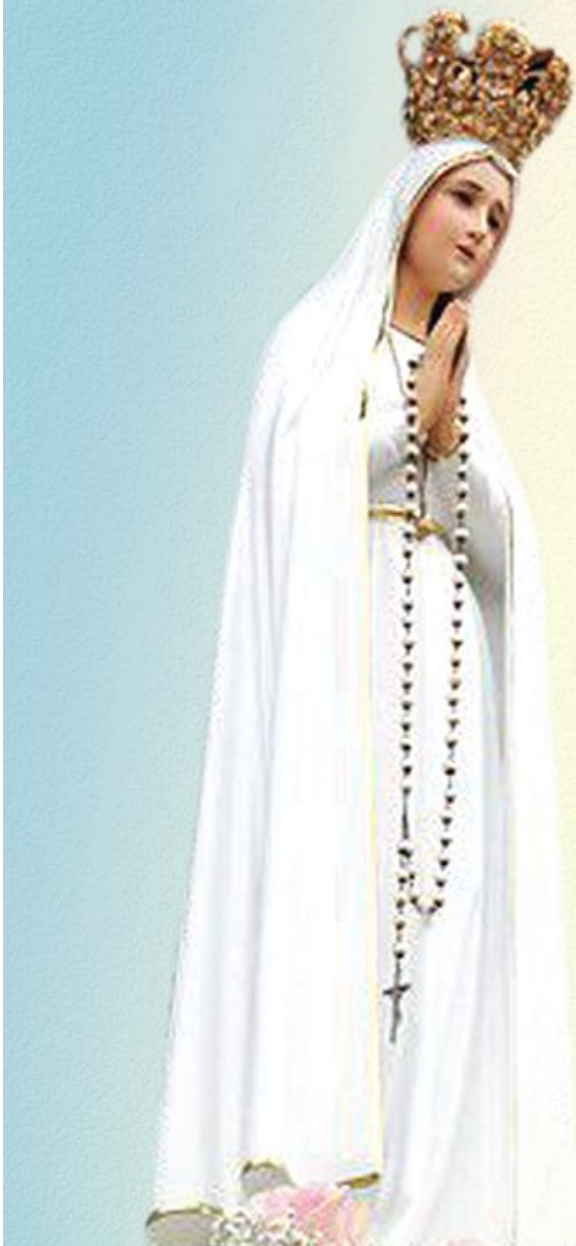

শারদীয় দুর্গোৎসব

ইতিহাস-ঐতিহ্যে দুর্গাপূজা

সর্বজনীন শ্রীশ্রী দুর্গাপূজা-ঐক্য শেখায়

মা মারীয়ার প্রতি ভক্তি ও পবিত্র জপমালা প্রার্থনার গুরুত্ব

মণ্ডলীর বাণীপ্রচার সেবাকাজের জন্য ধর্মপল্লী সমাজের পালকীয় রূপান্তর

প্রয়াত দীলিপ দেছা
জন্ম : ২৩ সেপ্টেম্বর, ১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২৭ অক্টোবর, ২০১৫ খ্রিস্টাব্দ

বিজ্ঞ/১৮৬/২০২০

পঞ্চম মৃত্যুবার্ষিকী

দীলিপ তোমরা এই ভুবনে এসেছিলে, ঈশ্বরের পরিকল্পনাতে। একে একে বাবা, মা, তুমি ও দিদি চলে গেলে আমাদের দুঃখের সাগরে ভাসিয়ে দিয়ে। কত স্বপ্ন, কত আশা ও কত ভালবাসা দিয়ে গড়ে গেলে অসংখ্য স্মৃতি, কত কথা ও কত ঘটনা। সেসব দিনগুলি অতিবাহিত করছি। তোমরা ছিলে, তোমরা আছ ও শেষ পর্যন্ত তোমরা থাকবে হৃদয়ের মাঝারে।

প্রার্থনা করি ও বিশ্বাস রাখি আমরাও একদিন সবায় মিলিত হবো, পরম পিতার ঐশরাজ্যে। তখন আমাদের শান্তি ও আনন্দের সীমা থাকবে না।

দীলিপের পরিবার ও আত্মীয়-স্বজন
ভাওলীয়া বাড়ি, মোলাশীকান্দা
নবাবগঞ্জ, ঢাকা।

প্রয়াত প্যাট্রেশিয়া পারুল গমেজ
জন্ম : ১ ডিসেম্বর, ১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২৮ অক্টোবর, ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ
সময় : রাত ১:৩০ মিনিট

বাদুরাবাড়ি, হাসনাবাদ, নবাবগঞ্জ, ঢাকা।
বর্তমানে-৬৬, মনিপুরীপাড়া, ঢাকা।

বিজ্ঞ/১৮৪/২০২০

অনন্তধামে যাত্রার প্রথম বছর

প্রিয় মা,

দেখতে-দেখতে একটি বছর হয়ে গেল, তুমি আমাদের মাঝে নেই। এক বছর আগেও ভাবিনি, আমাদের তিন ভাইবোনকে একা ফেলে তুমি চলে যাবে। এই একটি বছরে এমন কোনদিন ছিলো না যেদিন তোমার কথা আমাদের মনে পড়েনি মা। মা, শত অসুস্থতার মধ্যেও তুমি এই পরিবারের জন্য কত কত রাত জেগে প্রার্থনা করেছো। আমরা বিশ্বাস করি, বিগত একটি বছরে তুমি একইভাবে স্বর্গ থেকে আমাদের জন্য প্রার্থনা করেছ। আগামী দিনগুলোতেও তোমার আশির্বাদ সাথে নিয়ে যেন চলতে পারি- সেই প্রার্থনা করি আমাদের পরম করুণাময় পিতা পরমেশ্বরের কাছে। আমাদের এই পরিবারে তোমাকে ছাড়া চলতে কষ্ট হয় মা, কিন্তু আমরা জানি, তুমি এখন প্রভুর বাগানে আছো, আর সেখানে তোমার সঙ্গে আছে স্বর্গীয় দূত ও তোমার সারাজীবনের প্রার্থনার ফল। তোমার খবই ইচ্ছা ছিল নাতিদের দেখতে আমেরিকা যাওয়ার জন্য, কিন্তু সেই সময়টুকুও ঈশ্বর তোমাকে দিল না। অনেক দুঃখ নিয়ে তুমি চলে গেলে। মা, তোমার অনেক আশা অপূর্ণ রয়ে গেল। শেষ মুহূর্তে তোমার ছোট মেয়ে ও তিন নাতি তোমাকে বিদায় জানাতে আমেরিকা থেকে আসতে পারেনি। তবুও সর্বদা তোমাকে আমরা আমাদের প্রার্থনায় স্মরণ করি। তোমার ভালোবাসা আমরা এখনও অনুভব করি মা।

শোকার্তে–

স্বামী : লরেন্স খোকন গমেজ
বড় মেয়ে ও জামাই : লিপি ও নির্মল ডি'কস্তা
বড় নাতি : ভ্যালেরিও ডি'কস্তা
ছোট নাতি : নিথন ডি'কস্তা
ছোট মেয়ে ও জামাই : স্কলাষ্টিকা গমেজ মৌসুমী ও বার্নাবাস অপু রিবেরু
নাতি : ইথেন রিবেরু
আমেরিকা
ছেলে : আন্তনি কিশোর গমেজ
ছেলের বৌ : এমা রিবেরু

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী

■■■ বর্ষ : ৮০, সংখ্যা : ৩৯
■■■■■ ২৫ - ৩১ অক্টোবর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
■■■■■■■■■ ১০ - ১৬ কার্তিক, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

সম্পাদক

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

সম্পাদকীয় বোর্ড

ফাদার কমল কোড়াইয়া
মারলিন ক্লারা বাড়ৈ
থিওফিল নিশারন নকরেক

সহযোগিতায়

সুনীল পেরেরা
জ্যাষ্টিন গোমেজ
জাসিন্তা আরেং

প্রচ্ছদ পরিকল্পনা

ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু

প্রচ্ছদ ছবি

সংগৃহীত, ইন্টারনেট

সার্কুলেশন ও বিজ্ঞাপন

মেরী তেরেজা বিশ্বাস
লিটন ইসাহাক আরিন্দা

বর্ণ বিন্যাস ও গ্রাফিক্স

দীপক সাংমা
নিশুতি রোজারিও
অংকুর আন্তনী গমেজ

মুদ্রণ : জেরী প্রিন্টিং

৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

চিঠিপত্র/বিজ্ঞাপন/গ্রাহক

চাঁদা/ লেখা পাঠাবার ঠিকানা
সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
৬১/১, সুভাষ বোস এভিনিউ
লক্ষীবাজার, ঢাকা - ১১০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৪৭১১৩৮৮৫

E-mail : wklypratibeshi@gmail.com
Visit : www.weekly.pratibeshi.org

সম্পাদক কর্তৃক খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র ৬১/১ সুভাষ বোস এভিনিউ, লক্ষীবাজার ঢাকা-১১০০ থেকে মুদ্রিত ও প্রকাশিত

সম্পাদকীয়

মায়ের শক্তি ও তাঁর প্রতি ভক্তি

প্রাণীজগতে বিশেষ করে মানবকূলে মায়ের প্রতি সন্তানের বিশেষ অনুরাগ পরীলক্ষিত হয়। স্বাভাবিকধারায় সন্তান যেন মার সাথেই বেশি সম্পর্কযুক্ত। সন্তানের যেকোন অবস্থায় মা-ই প্রথম এগিয়ে আসেন। মা সন্তানকে আগলে রাখেন এবং সর্বাবস্থায় বিপদমুক্ত রাখতে চেষ্টা করেন। সন্তানের মঙ্গলের জন্য তিনি সর্বশক্তি ব্যবহার করেন। নিজ জীবন উৎসর্গ করেও মা সন্তানকে ভালো রাখতে চান। ফলে সন্তানের কাছেও মা রক্ষাকারিণী, ভালবাসার রাণী ও শক্তিশালিনী এক নারী। মা-সন্তানের এ মহিমান্বিত সৌন্দর্যের বর্ণনা আমরা বিভিন্ন ধর্ম থেকে জানতে পারি।

খ্রিস্টধর্মের পবিত্র ধর্মশাস্ত্র বাইবেলে বর্ণিত আছে, প্রথম নারী হবা শয়তানের প্রলোভনে পাপে পতিত হলেও নবীনা হবা (মারীয়া) জয়ী হলেন। ঈশ্বর প্রলোভনকারী সাপকে বললেন, আমি তোমার ও নারীর মধ্যে শত্রুতা জাগিয়ে তুলবো। নারী তোমার মস্তক চূর্ণ করবে *(আদি ৩:১৫)*। ছলনা ও মন্দতার অধিপতি শয়তানকে একজন সাধারণ নারী মারীয়া পরাজিত করলেন। হিন্দুধর্মেও দেখি একজন নারী দেবী দূর্গা পরাক্রমশালী অসুরকে পরাজিত করে পৃথিবীতে শান্তি আনলেন। এমনিভাবে বিভিন্নধর্মে নারী শক্তি বা মায়ের শক্তির কথা বলা হয়েছে। মায়ের বা নারীর মধ্যে রয়েছে জীবনদানের শক্তি; জীবনকে রক্ষা করার জন্য রয়েছে ধৈর্য-শৌর্য, ত্যাগ-তিতিক্ষার শক্তি। মায়েদের ত্যাগের, সহিষ্ণুতা ও ভালবাসার শক্তিকে সবসময় স্বীকৃতি দিতে হয়।

খ্রিস্টবিশ্বাসীরা জন্মদাত্রী মায়ের সাথে-সাথে যিশুর মা মারীয়াকেও স্বর্গীয় মা হিসেবে বিশেষ শ্রদ্ধা–ভক্তি প্রকাশ করে। মা মারীয়া তাঁর সন্তান যিশু ও প্রেরিত শিষ্যদের যেভাবে আগলে রাখতেন, ঠিক একইভাবে বর্তমানে আমাদেরকে আগলে রাখেন এবং বিপদমুক্ত রাখেন। বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে দেখা দিয়ে তাঁর সন্তানদের আহ্বান করছেন যেন তারা পাপীদের মন পরিবর্তন ও জগতের শান্তির জন্য প্রার্থনা করেন। বিশেষভাবে রোজারিমালা প্রার্থনা যেন করেন। এই অক্টোবর মাসে খ্রিস্টবিশ্বাসীরা বিশেষভাবে স্মরণ করে জপমালা রাণী কুমারী মারীয়ার কথা। শরতের আকাশের ন্যায় নীলসাদা পোষাকে অনিন্দ্যসুন্দর মুখশ্রীর অধিকারিণী মা মারীয়া নিজে মালা প্রার্থনা করে সকল সন্তানকে অনুপ্রাণিত করছেন যেন সকলে এ মালা প্রার্থনা করে। বিভিন্ন ধর্মপ্রদেশ, ধর্মপল্লী, গ্রাম, ব্লক ও পরিবারে মালা প্রার্থনা করার জন্য নানামুখী কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়। আনুষ্ঠানিক কর্মসূচীর বাইরে গিয়ে দৈনন্দিন মালাপ্রার্থনা প্রত্যেকজন খ্রিস্টবিশ্বাসীর অভ্যাসে পরিণত হোক। পারিবারিক মালা প্রার্থনা পরিবারে শান্তি দান করার সাথে ব্যক্তিকে শান্তি ও আনন্দে থাকতে সহায়তা করে। আমরা একটু শান্তি ও সুখের জন্য কত সময় ও কঠিন কাজ করে যাচ্ছি কিন্তু অল্প একটু সময় নিয়ে মালা প্রার্থনা করতে কার্পণ্য করছি কেন! জপমালা প্রার্থনার মধ্যদিয়ে পৃথিবীতে ও পরিবারে শান্তি রাখা সম্ভব। তাই পারিবারিক মালাপ্রার্থনা খুবই দরকার। মালাপ্রার্থনার গুরুত্ব তুলে ধরে এর চর্চা চালিয়ে যাবার যে উদ্যোগ পবিত্র ক্রুশ পারিবারিক জপমালা সেবা কার্যক্রম, বাংলাদেশ গ্রহণ করেছে তা সকলের সহযোগিতায় আরো বেশি বিস্তৃত হোক। পরিবারে শান্তি বজায় রাখতে পারিবারিক জপমালা প্রার্থনার বিকল্প নেই।

নারী বা মাতৃশক্তির আরেকটি প্রকাশ দেখি দেবী দুর্গাতে। যেই অসুরের কাছে সকল পুরুষ শক্তি পরাজিত সেখানে নারী শক্তির প্রতীক দেবী দুর্গা বিজয়ী। তাই অসুরের উপর সুরের, মন্দতার উপর মঙ্গলের বিজয়ী হওয়ার আহ্বান রাখে শারদীয় দুর্গোৎসব। শারদীয় দুর্গাপূজা হিন্দু ভাইবোনদের অন্যতম বৃহৎ ধর্মীয় উৎসব হলেও এর আহ্বানে ও শিক্ষায় জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলেই অংশী হতে পারি। বিকৃত মানসিকতার কিছু কুলাঙ্গার পুরুষ নারীকে পণ্য হিসেবে বিবেচনা করে ধর্ষণের মতো জঘণ্য অপরাধ করার সাহস পাচ্ছে। তা করার মধ্যদিয়ে শুধুমাত্র একজন নারীকে অপমান করছে তা নয়। নারী শক্তিকে অপমান করছে। নারীর অপমানরোধ করতে হলে সংকীর্ণ মানসিকতার পরিবর্তন আনতে হবে। ছোটবেলা থেকেই একজন শিশুকে পরিবার ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নারীর প্রতি ভক্তি-শ্রদ্ধা-সম্মানদানের শিক্ষাদান করতে হবে। ✝

মঙ্গলবাণী

"তোমরাই সুখী, লোকে যখন আমার জন্য তোমাদের নিন্দা ও নির্যাতন করে, এবং তোমাদের বিরুদ্ধে মিথ্যামিথ্যি সব ধরনের জঘন্য কথা বলে। - *মথি ৫: ১১*

অনলাইনে সাপ্তাহিক প্রতিবেশী পড়ুন : www.weekly.pratibeshi.org

সাধু যোসেফের কারিগরি বিদ্যালয়ে ভর্তি সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

সাধু যোসেফ কারিগরি বিদ্যালয়

৩২, শাহ সাহেব লেন, নারিন্দা, ঢাকা-১১০০

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্যে জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ২০২১ খ্রিস্টাব্দে ভর্তির কার্যক্রম অতিসত্বরই শুরু হতে যাচ্ছে।

ভর্তি পরীক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় যোগ্যতা ও কাগজপত্র:

১। অষ্টম শ্রেণি পাশ করার পর পরবর্তী শ্রেণিগুলোতে অধ্যয়নরত থেকে দ্বাদশ শ্রেণি পর্যন্ত;
২। খ্রিস্টান শিক্ষার্থীদের ক্ষেত্রে বাপ্তিস্মের সার্টিফিকেট, পাল-পুরোহিতের সুপারিশ এবং বিদ্যালয়ের ছাড়পত্র;
৩। জাতীয় পরিচয় পত্রের কপি (যদি থাকে)
৪। সম্প্রতি তোলা দুই কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি;
৫। ভর্তি পরীক্ষার আগে মৌখিক পরীক্ষা হবে। তবে পরীক্ষার বিষয়ে বিস্তারিত ০৫/১২/২০ খ্রিস্টাব্দ থেকে ১০/১২/২০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে এই নম্বরে ফোন করে জানতে হবে ০১৭১১৫২৮২০৯, ০১৫৫৬৪৪৯৭২৮, ০২-৪৭১১৫৯৯৫, ০১৭৩২৪৬৬৬৩৩ ।

অনুগ্রহপূর্বক লক্ষ্য করুন যে, বিগত বছর (২০১৯) থেকে এ বিদ্যালয়ে চারটি বিষয়ের ওপর (মেশিন, ইলেক্ট্রিক, ওয়েল্ডিং এবং কার্পেন্ট্রি) কারিগরি শিক্ষা প্রদান করা হচ্ছে, অর্থাৎ মেকানিক্যাল কোর্স হিসেবে কোন বিষয় থাকছে না।

খ্রিস্টান শিক্ষার্থীদের হোস্টেলে থাকা ও খাওয়া বাবদ মাসে ৫৫০ টাকা (তিন বছর মেয়াদী কোর্সের জন্য), ৬০০ টাকা (দুই বছর মেয়াদী কোর্সের জন্য), এবং ৬৫০ টাকা (এক বছর মেয়াদী কোর্সের জন্য)। প্রশিক্ষণের জন্যে প্রতি মাসে শিক্ষার্থীদের জন্য ১০০ টাকা বেতন দিতে হবে, যা তাদেরকে এখানে কাজ করেই উপার্জন করতে হবে। তাছাড়া, প্রশিক্ষণার্থীদেরকে এখানে বিভিন্ন উৎপাদনমুখী কাজেও অংশ নিতে হয় বিধায় পরিশ্রম করার মানসিকতাসম্পন্ন শিক্ষার্থীদেরকেই অগ্রাধিকার দেওয়া হবে।

ভর্তি পরীক্ষায় যারা উত্তীর্ণ হবে তারা উপরোক্ত যে কোন বিষয়ের উপর যথাক্রমে এক বা দুই অথবা তিন বছরের প্রশিক্ষণ পাবে, যা ভর্তির পর প্রথম সাময়িক পরীক্ষার ফলাফলের ওপর ভিত্তি ক'রে নির্বাচন/নির্ধারণ করা হবে।

যারা তিন এবং দুই বছরের দীর্ঘমেয়াদী কোর্সে সুযোগ পাবে তাদের সীমিত সংখ্যক শিক্ষার্থীর জন্যে বৃত্তির ব্যবস্থা থাকবে, তা-ও প্রথম সাময়িক পরীক্ষার ফলাফলের উপর নির্ভরশীল। বিশেষ বিবেচনায় অত্যন্ত দরিদ্রদের জন্যেও এ বৃত্তির ব্যবস্থা থাকবে। এক বছর মেয়াদী প্রশিক্ষণের জন্যে কোন বৃত্তির ব্যবস্থা থাকবে না।

বাৎসরিক ভর্তি ফি: প্রথমবারের জন্য - ২,২৫০ টাকা
পরবর্তী প্রতি বছরের জন্য - ১,৫০০ টাকা

যারা ভর্তি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে এবং হোস্টেলে থাকবে তাদেরকে প্রয়োজনীয় ব্যক্তিগত জিনিসপত্র নিয়ে বিদ্যালয়ে কত তারিখে উপস্থিত থাকতে হবে তা পরবর্তীতে জানানো হবে। প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের মধ্যে অবশ্যই থাকতে হবে:

১। মশারিসহ বিছানাপত্র, ব্যক্তিগত কাপড়-চোপড়, ইত্যাদি ।
২। জানুয়ারি মাসের বেতনসহ ভর্তি ফি টাকা ২,৭৫০ (প্রথম সাময়িক পরীক্ষার পর মাসিক বেতন কোর্সের মেয়াদ অনুসারে নির্ধারিত হবে)
৩। ক্লাশের বই-খাতার জন্যে আরো অতিরিক্ত কিছু টাকা।

বিস্তারিত তথ্যের জন্য যোগাযোগ করার টেলিফোন নম্বর: (০২-৪৭১১৫৯৯৫ বা ০১৭১১-৫২৮২০৯) এবং ই-মেইল নম্বর:
Br. Lawrence Rinku Costa CSC: (rinkucosta@yahoo.com.au)
ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিতদের বিশেষভাবে অনুরোধ করা হচ্ছে, এ ব্যাপারে বিদ্যালয় অধ্যক্ষের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতে যেন সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করা যায়।

ব্রাদার লরেন্স রিংকু কস্তা, সিএসসি
অধ্যক্ষ
মোবাইল: ০১৫৫৬৪৪৯৭২৮

বিপ/১৯০/২০

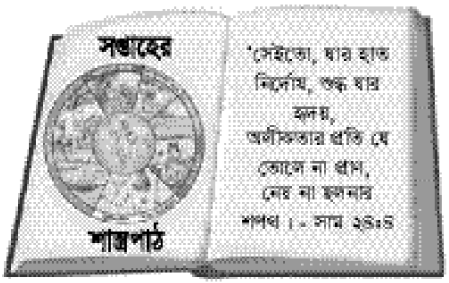

কাথলিক পঞ্জিকা অনুসারে সপ্তাহের বাণীপাঠ ও পার্বণসমূহ ২৫ - ৩১ অক্টোবর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

২৫ অক্টোবর, রবিবার

যাত্রা ২২: ২০-২৬, সাম ১৮: ১-৩, ৪৬, ৫০, ১ থেসা ১: ৫গ-১০, মথি ২২: ৩৪-৪০

২৬ অক্টোবর, সোমবার

এফে ৪: ৩২-৫: ৮, সাম ১: ১-৪, ৬, লুক ১৩: ১০-১৭

২৭ অক্টোবর, মঙ্গলবার

এফে ৫: ২১-৩৩, সাম ১২৮: ১-৫, লুক ১৩: ১৮-২১

২৮ অক্টোবর, বুধবার

সাধু শিমোন ও যুদ, প্রেরিত শিষ্য, পর্ব দিবস

এফে ২: ১৯-২২, সাম ১৯: ২-৩, ৪-৫, লুক ৬: ১২-১৯

২৯ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার

এফে ৬: ১০-২০, সাম ১৪৪: ১-২, ৯-১০, লুক ১৩: ৩১-৩৫

৩০ অক্টোবর, শুক্রবার

ফিলিপ্পীয় ১: ১-১১, সাম ১১১: ১-৬, লুক ১৪: ১-৬

৩১ অক্টোবর, শনিবার

ফিলিপ্পীয় ১: ১৮খ-২৬, সাম ৪২: ১-২, ৪, লুক ১৪: ১, ৭-১১

প্রয়াত বিশপ, পুরোহিত, ব্রতধারী-ব্রতধারিণী

২৫ অক্টোবর, রবিবার

+ ১৯৫৬ সিস্টার বার্টিল্লা পেলেগাত্তা এসসি (দিনাজপুর)
+ ১৯৯৯ সিস্টার মেরী কার্মেল এসএমআরএ (ঢাকা)

২৭ অক্টোবর, মঙ্গলবার

+ ১৯৩৩ সিস্টার প্যাসিয়েন্সা লুডোভিক সিএসসি
+ ১৯৮৯ সিস্টার রোজা সজ্জি পিমে (দিনাজপুর)
+ ১৯৯৭ সিস্টার মেরী আলমা পিসিপিএ (ময়মনসিংহ)

২৯ অক্টোবর, বৃহস্পতিবার

+ ১৯৭৯ ফাদার যোসেফ এম রিক্ সিএসসি (ঢাকা)
+ ২০০১ সিস্টার ইম্মাকুরেট মিত্র এসসি (ঢাকা)

৩০ অক্টোবর, শুক্রবার

+ ১৯৭২ সিস্টার এম ডেনিস পেরেইরা আরএনডিএম (চট্টগ্রাম)

৩১ অক্টোবর, শনিবার

+ ১৯৫৯ সিস্টার থিওটাইম গিলর্বার্ট সিএসসি
+ ১৯৯৪ ফাদার আলেসান্দ্রো পেরিকো পিমে (দিনাজপুর)

স্বামীর ঘরে আমি আর যাব না

নীলমনির গায়ের রং বেশ ফর্সা। আর সে কারণেই তার অহংকার একটু বেশি। খামখেয়ালিপনাও তার স্বভাবের আর একটা দিক। সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের মেয়ে সে। রাজধানীর এক মাঝারি গঠনের যুবকের সাথে তার বিয়ে হয়েছে মাত্র ক'দিন আগে। দু'সপ্তাহ পার না হতেই একদিন দেখা গেল, নীলমনি বাপের বাড়িতে এসে ওঠেছে। পিতামাতা ভাইবোন অবাক, সবার প্রশ্ন, হঠাৎ বলা নেই কওয়া নেই তুমি একা-একা চলে এলে, কি খবর? নীলমনি হাসল, বলল আমি আর ও বাড়ি যাব না। বা! কি চমৎকার কথা! কাথলিক মণ্ডলীতে বিয়ে অবিচ্ছেদ্য; আর, নীলমনি নির্দিধায় খাড়া পায়ে বলে ফেলল, আমি আর যাব না। সবার চোখ কপালে উঠে গেল। বিস্তারিত ঘটনা কি, বল শুনি, ইত্যাদি সব বলাবলি চলল বহুক্ষণ ধরে। তবে যে যাই বলুক না কেন, নীলমনি নির্বিকার, "স্বামীর ঘরে আমি আর যাব না।" তবে বিয়ে হয়েছিলে কেন? না করলেই পারতে? এমন তরো প্রশ্ন অবশ্য বলে ফেলেছিল, আমার তো বিয়ে করার ইচ্ছা ছিল না, বাবা-মা বিয়ে দেবার জন্য পাগল, তাই হয়েছিলাম। এখন এসে পড়লাম। অদ্ভুত কথা! এ যেন ছেলেখেলা। হতে বললো, হলাম; হওয়া শেষ এসে পড়লাম! এ আর এমন কি বিষয়! সেটাই কথা প্রিয় পাঠকগণ, বিয়ের গুরুত্ব যেন তেমন কিছু নেই। পিতা-মাতাগণ মেয়ে হলে তাকে বিয়ে দিয়ে শান্তিলাভ করতে চান, হাফ ছেড়ে বাঁচতে চান। মেয়ের মতি-গতির দিকে অনেক সময় তাদের তত খেয়াল থাকে না। তবে, সাধারণত মেয়েরাও যে বিয়ে হতে চায় না তাতো নয়। বিয়ে হয়, পিতা-মাতা, অভিভাবকেরা চেষ্টা ফিকির করেন সেটাও স্বাভাবিক বিষয়। এতে দোষেরই বা কি আছে? মেয়েদের তো সংসারে যেতে হবে সেটাই বিধান। তাহলে নীলমনি, তুমি দায় চাপাচ্ছ কার উপর? পিতা-মাতা অভিভাবকের উপর! কই, বিয়ের আগে তো পিতা-মাতাকে বলোনি আমার বিয়ে হবার ইচ্ছা নেই। বরং সাধারণভাবে নাম লেখালেখির পর মণ্ডলীর নিয়ম অনুযায়ী যতদিন সময় দেয়ার কথা; তা বিবেচনা না করে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বিয়ে দেয়া যায়; তাই করা হয়েছিল তোমাদের বিয়েতে। তখন তুমি কিন্তু একবারের জন্যও বলোনি, আমি বিয়ে হবো না। বরং তখনতো বিয়ের কথা শুনে পুলকিত হয়েছিলে। লজ্জায় লাল হয়েছিলে। চোরা চোখে দেখেছিলে, ইত্যাদি-ইত্যাদি। সেসব কি তুমি ভুলে গেছ? না, তুমি মেয়ে, তুমি ভুলে যাবে কেন? ভুলনি, মেয়েরা সহজে কিছুই ভুলে না। তোমার ছলনা, তোমার সর্বনাশী খেলা! এর ব্যাখ্যা নাই। ছেলের পক্ষ অভিযোগ জানালো মিশনের পাল-পুরোহিতের কাছে। দিন-তারিখ করে উভয়পক্ষ এবং ধর্মপল্লীর সদস্যদের কয়েকজন গণ্যমান্য সদস্যসহ এই সমস্যার মীমাংসার জন্য বসা হলো। চার/পাঁচ ঘন্টা যাবৎ বুঝা-পড়া হলো উভয়পক্ষের কথাবার্তা। বিশেষ করে, মেয়েকে দেয়া হলো অনেক বুঝ, অনেক জ্ঞান, সংসার জীবন সম্পর্কে। ছেলেকেও বলা হয়েছিল জীবন সঙ্গীকে নিয়ে সারাজীবন চলার যত অভিজ্ঞতার কথা। আলাপ আলোচনায় বুঝা গিয়েছিল ছেলের বাড়ির সদস্যরা নীলমনিকে তেমন সহযোগিতা না করেই তার নিকট হতে সবকিছু আশা করে এসেছে। এখন দায় সবই নীলমনির। হ্যাঁ প্রিয় পাঠক, সকল দায় নীলমনির। কারণ নীলমনি তো মেয়ে মানুষ, তাই। মেয়েদের সবকিছু সয়ে নিতে হয়, তাদের কোন অভিযোগ থাকতে নেই, তাদের অভিযোগ কাউকে শুনতে নেই। নীলমনি সেদিন অনেক ভয় পেয়ে গিয়েছিল। ফাদার যেভাবে তার দিকে তাকিয়ে গলাবাজি করছিলেন, মনে হচ্ছিল যদি সে যেতে না চায় তাহলে ফাদার তাকে মেরেই বসেন। তাই অনিচ্ছা স্বত্ত্বেও স্বামীর ঘরে যেতে রাজি হয়ে গিয়েছিল। সবাই হাফ ছেড়ে বাঁচলো। পরদিন সেই দম্পতি রওনা দিল। যথাসময়ে জায়গামতো স্থানে পৌছালে পর মেয়ে তার স্বামীকে কিছু না বলেই সোজা বেবিটেক্সি ধরে রওনা দিল তার আত্মীয়ের বাড়িতে। স্বামী ডাকাডাকি করল কিন্তু কোন লাভ হলো না। নীলমনি কানে তুলো দিয়েছে। স্বামীর ডাক আর তার কানে যাচ্ছে না। ফাদারের সামনে বসে সে মনে-মনে ফন্দি এঁটেছিল। সবাই চাপাচাপি করছে। ফাদারও গলা উঁচিয়ে কথা বলছেন। বলা যায় না, রাজি না হলে ফাদার মারতেও পারেন। আলাপে বসা লোকদের হাত থেকে বাঁচতে আমাকে চালাকির পথ ধরতেই হবে। নীলমনি চালাকির পথই ধরল। দশদিনের বধু সেই যে গেল, একেবারে চিরদিনের জন্যই গেল, আজো ফিরলো না। হতভম্ব স্বামী বিষন্ন মনে বাড়ি ফিরে গেল। কে বুঝবে আজকালকের ছেলে-মেয়েদের মন? এখন ছেলেটি হতাশায় বলে, নীলমনি তুমি এত দুর্বোধ্য! কি তোমার আসল রূপ? তুমি এত পারো। তোমাকে বুঝা বড়ই দায়। তোমার এসবের কোন ব্যাখ্যা নেই, ব্যাখ্যা চলে না, কোন ব্যাখ্যাই মিলে না। পরিশেষে শুধু বলি, তুমি আর যা-ই করো; আর কাউকে কাঁদিও না। নীলমনি তুমি ভাল থেকো॥

বেনেডিক্ট মূর্মূ, রাজশাহী।

মা মারীয়ার প্রতি ভক্তি ও পবিত্র জপমালা প্রার্থনার গুরুত্ব

ফাদার এলিয়াস পালমা সিএসসি

কুমারী মারীয়া একজন মহান আলোকিত ব্যক্তিত্ব

মা মারীয়া এমন একজন ব্যক্তি যিনি ইতিহাসের সময় ও ভৌগলিক স্থানকে অতিক্রম করেছেন। তিনি এখনো অগণিত মানুষকে অনুপ্রাণিত করছেন। কবিগণ তাঁকে নিয়ে অনেক কবিতা ও গান লিখেছেন। লেখকগণ তাঁকে নিয়ে অনেক প্রবন্ধ ও বই লিখেছেন। শিল্পীগণ তাঁকে নিয়ে অনেক ছবি এঁকেছেন। অনেক ব্যক্তি তাঁর নাম ধারণ করেছেন। অনেক তীর্থমন্দির, গির্জা, স্কুল-কলেজ, সংঘ-প্রতিষ্ঠান মারীয়ার নামে উৎসর্গ করা হয়েছে। অনেক ধর্ম-সংঘ (Religious Congregations) মারীয়ার নামে ও আধ্যাত্মিকতায় গড়ে উঠেছে। কুমারী মারীয়া হলেন সমগ্র বিশ্বে সর্বশ্রেষ্ঠ নারী।

কুমারী মারীয়ার সংক্ষিপ্ত পরিচিতি

কুমারী মারীয়া ছিলেন গালিলিয়া প্রদেশের নাজারেথ গ্রামের এক কৃষক-বালা। তিনি চৌদ্দ বছর বয়সেই ঈশ্বর-পুত্রের জননী হবার আহ্বান লাভ করেন। কুমারী মারীয়ার পিতা-মাতা সম্বন্ধে পবিত্র বাইবেলে কিছুই উল্লেখ করা হয়নি। তবে মণ্ডলী কর্তৃক অসমর্থিত সাধু জেমসের মঙ্গলসমাচার অনুসারে মারীয়ার পিতার নাম যোয়াকিম, আর মাতার নাম আন্না বা হান্না বলে উল্লেখ করা হয়েছে।

মারীয়ার পিতা-মাতা খুব ঈশ্বর-ভীরু ও ধার্মিক ছিলেন। তিনি ছিলেন পিতামাতার বৃদ্ধ বয়সের একমাত্র সন্তান। শৈশবে মারীয়ার পিতামাতা তাঁকে মন্দিরে উৎসর্গ করেন। কিন্তু এই সম্পর্কে পবিত্র বাইবেলে কিছুই উল্লেখ নেই। মারীয়া একজন অতি সাধারণ ঘরের/পরিবারের মেয়ে হলেও তিনি ছিলেন এক সুন্দর চরিত্রের মানুষ।

মারীয়া ছিলেন গভীর বিশ্বাসের মানুষ। তিনি ছিলেন ধ্যানময়ী ও প্রার্থনাশীল নারী। তাই অনেক ছবিতে/মূর্তিতে তাঁকে প্রার্থনাশীল অবস্থায় দেখা যায়। মারীয়া ছিলেন বাধ্য ও অনুগত নারী, যা তিনি শিখেছিলেন তাঁর পিতা-মাতার কাছে থেকে। মারীয়া এক আলোকিত নারী, যিনি তাঁর জীবন-আদর্শ দিয়ে অগণিত মানুষকে আলোকিত করে চলেছেন।

প্রার্থনার শক্তিতে মন্দের পরাজয়

যিশু বলেন, "প্রার্থনা কর, যেন প্রলোভনে না পড়।" প্রশ্ন উঠতে পারে: যিশু কেন

প্রলোভন জয় করতে আমাদেরক প্রার্থনা করতে বলেন? এই প্রশ্নটিও করা যেতে পারে: আমাদের মধ্যে এমন কে আছে, যার জীবনে কোনদিনও কোন প্রকার প্রলোভন আসেনি? নিষ্পাপ শিশুদের ছাড়া এমন কোন মানুষই খুঁজে পাওয়া যাবে না, যার জীবনে কোন প্রলোভন আসেনি। প্রলোভন আমাদের জীবনেরই একটি বাস্তবতা। কিন্তু কী করলে প্রলোভন থেকে রেহাই পাওয়া যায়, বা কী করে প্রলোভন জয় করা যায়?

প্রার্থনা হলো প্রলোভন জয় করার সবচেয়ে বড় শক্তি। অর্থ-বিত্ত দিয়ে কখনো প্রলোভন জয় করা যায় না। বুদ্ধির তীক্ষ্ণতা দিয়েও কখনো প্রলোভন জয় করা যায় না। ক্ষমতা বা বাহুবল দিয়েও কখনো প্রলোভন জয় করা যায় না। প্রার্থনা হলো প্রলোভন জয় করার সবচেয়ে বড় শক্তি, যা আমাদেরকে ঈশ্বরের উপস্থিতিতে নিয়ে যায় এবং আমাদেরকে প্রলোভন জয় করতে শক্তি দান করে।

মহাত্মা গান্ধী বলেন: "আমি পণ্ডিত ব্যক্তি হতে চাই না, কিন্তু প্রার্থনার মানুষ হতে চাই।" তিনি ধ্যানী ও প্রার্থনার মানুষ ছিলেন বলেই যিশুর মত জীবনের অনেক প্রলোভন জয় করে সাধু-মানুষ হতে পেরেছিলেন।

'কিশোর-রত্ন' সাধু ডমিনিক সাভিও তাঁর জীবন-স্বপ্ন দেখেছিলেন এই বলে: "আমি সাধু হতে চাই।" তাঁর পরিবারের প্রার্থনা-জীবন থেকেই তিনি এত সুন্দর স্বপ্ন দেখতে পেরেছিলেন। তিনি প্রতিদিন সবার আগে গির্জায় যেতেন। প্রার্থনার শক্তিতে ও ঐশ করুণায় বলীয়ান হয়ে তিনি প্রতিজ্ঞা করেছিলেন: "আমি মরবো, তবুও পাপ করবো না। পাপ করার চেয়ে মৃত্যুও ভাল।"

পারিবারিক জীবন সুরক্ষায় জপমালা প্রার্থনা

বর্তমানে পরিবারগুলো অনেক বিপদ ও চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হচ্ছে। যেমন: দারিদ্র্য, বেকারত্ব, বিবাহ বিচ্ছেদ, অবৈধ বিবাহ, বহু বিবাহ, অ-নৈতিক জীবন, ব্যক্তিগত ধ্যান-প্রার্থনায় অভাব, পারিবারিক প্রার্থনা-জীবনে শিথিলতা, গির্জা-প্রার্থনায় অনুপস্থিতি ও অনিহা, বিশ্বাসে দুর্বল হয়ে পড়া, জাগতিক ভোগ-বিলাসিতা, টেলিভিশন-মোবাইল-ইন্টারনেট, ইত্যাদি মিডিয়ায় অত্যধিক সময় কাটানো, পরকিয়া-প্রেম, ইত্যাদি নানান সমস্যায় পরিবারগুলো জর্জরিত। এসব বিপদ হতে রক্ষা পেতে পারিবারিক জপমালা প্রার্থনা একটি বড় শক্তি হিসাবে কাজ করে।

পারিবারিক জপমালা প্রার্থনার শক্তি

পরিবারকে রক্ষা করতে পারিবারিক জপমালা প্রার্থনা সবচেয়ে বড় শক্তি হিসাবে কাজ করে। পারিবারিক জপমালা প্রার্থনা প্রেম, শান্তি ও ক্ষমার রজ্জু দিয়ে পরিবারের সবাইকে মালার মত করে একতার বন্ধনে বেঁধে রাখে। তাই "জপমালা-যাজক" ও ঈশ্বরের সেবক ফাদার প্যাট্রিক পেইটন পারিবারিক জপমালা প্রার্থনার ওপর জোর দিয়ে বলেছেন:

"যে পরিবার একত্রে প্রার্থনা করে, সেই পরিবার একত্রে বাস করে।"

তিনি আরো বলেছেন: "প্রার্থনারত বিশ্ব হলো শান্তিময় বিশ্ব।"

তাই, আমাদের ব্যক্তিগত জীবনে, পরিবারে, সমাজে, রাষ্ট্রে ও বিশ্বে শান্তির জন্য জপমালা প্রার্থনার আশ্চর্য ফল আমরা পেয়ে থাকি। মা মারীয়া হলেন শান্তি-রাণী। আমাদের অশান্ত জীবনে শান্তির জন্য মা মারীয়ার মাধ্যমে প্রার্থনা করে অনেকে অনেক ফল পেয়েছেন। পবিত্র জপমালা প্রার্থনা হলো সবচেয়ে সহজ প্রার্থনা, যে কোন সময়, যে কোন স্থানে, কোন বই ছাড়াই করা যায়।

পারিবারিক জপমালা প্রার্থনা হলো পরিবারের খাদ্য

যিশু বলেছেন: "মানুষ কেবল রুটিতেই বাঁচতে পারে না, বরং ঈশ্বরের শ্রীমুখে উচ্চারিত প্রতিটি বাণীকে সম্বল করেই সে বেঁচে থাকতে পারে" *(মথি ৪:৪; লুক ৪:৪)*। আমাদের এই সুন্দর পৃথিবীতে অনেক উদাহরণ রয়েছে, যেখানে দেখা গেছে যে, অর্থ-সম্পদেও প্রচুর প্রাচুর্য ছিল। কিন্তু অনেকে অসুখী-হতাশায়, নিরাশায়, নিরানন্দে ও একাকিত্বে দিন অতিবাহিত করছেন। প্রার্থনা জীবনকে শান্তি দেয়, প্রার্থনা জীবনকে পরম সুখদাতার সঙ্গে মিলিত করে এক সুখের সন্ধান দেয়। তাই, প্রার্থনা পরিবারের ছোট-বড়, নারী-পুরুষ সবার জন্য এক উত্তম সুস্বাদু খাদ্য, যা আমাদের হৃদয়-আত্মাকে বাঁচিয়ে রাখে। এই খাদ্য পরিবারকে সবার জন্য একান্ত প্রয়োজন। তাই, পরিবারকে বাঁচিয়ে রাখার জন্য বাবা-মা, ছেলেমেয়ে সবাই একত্রে এই প্রার্থনা করা প্রয়োজন। যিশু আমাদেরকে বলতে চান: "আমাকে একজন প্রার্থনাশীল পিতা-মাতা দাও। আমি মণ্ডলীতে সাধু-সাধ্বী উপহার দেবো।"

পরিবার হলো "গৃহ-মণ্ডলী"

দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভার শিক্ষা অনুসারে, প্রতিটি খ্রিস্টীয় পরিবার হলো একেকটি "গৃহ-মণ্ডলী"। এই "গৃহ-মণ্ডলী"ই হলো স্থানীয় মণ্ডলী ও বিশ্ব মণ্ডলীর ভিত্তি। প্রার্থনারত পরিবারই হলো প্রার্থনাশীল মণ্ডলীর চিহ্ন। আমরা অনেকেই পবিত্র খ্রিস্টযাগে অংশগ্রহণ করতে প্রতিদিন গির্জায় যেতে পারি না। কিন্তু আমরা প্রতিদিন নিজ বাড়িতে বসে মা মারীয়ার সাথে যিশুর জীবন ধ্যান করতে পারি, তাঁর বাণী শুনতে পারি, যখন আমরা পবিত্র জপমালা প্রার্থনা করি। প্রার্থনার সময় আমরা পরিবারের সবাই মিলে যিশুর আরাধনা করতে পারি, তাঁর জয়গান গাইতে পারি। একটি প্রার্থনাশীল পরিবার হলো প্রার্থনাশীল মণ্ডলীর চিহ্ন। একটি প্রার্থনাশীল পরিবার মণ্ডলীতে যাজক ও ব্রতীয় জীবনের ব্যক্তিদের উপহার দেয় এবং পৃথিবীতে সাধু-সাধ্বী উপহার দেয়।

পবিত্র জপমালা প্রার্থনা হলো আহ্বানের বীজভাণ্ডার

পবিত্র জপমালা প্রার্থনা হলো আহ্বানের বীজ ও বৃদ্ধিতে সহায়ক। প্রায় সকল যাজক ও ব্রতীয় জীবনধারী ব্যক্তিগণ তাদের আহ্বান পেয়েছেন পারিবারিক জপমালা প্রার্থনা থেকে। তা আশ্চর্যভাবে যাজকীয় ও ব্রতীয় জীবনে আহ্বান বৃদ্ধিতে কাজ করে। জপমালা প্রার্থনা পুরোহিত ও ব্রতধারী-ব্রতধারিণীদের উৎসর্গীকৃত জীবন-আহ্বান রক্ষা করে। পবিত্র জপমালা যাজকের জীবন রক্ষা করে। মা মারীয়া যেমন শিশু যিশুকে রক্ষা করেছিলেন, তেমনিভাবে, যে ব্যক্তি প্রতিদিন ভক্তিভরে মায়ের মালা জপ করে, তাকে রক্ষা করতেও মা মারীয়া এগিয়ে আসেন। যেসব স্বামী-স্ত্রীর বিবাহিত জীবন ভেঙ্গে গেছে বা নানাবিধ সমস্যায় ভরপুর, এমন কি, যেসব পুরোহিত-ব্রতধারী/ধারিণী এই নিবেদিত জীবন ছেড়ে চলে গেছেন, তাদের জীবনের খোঁজ নিলে দেখা যায় যে, (পারিবারিক) জপমালা প্রার্থনা তাদের জীবনে দারুণভাবে অনুপস্থিত ছিল।

প্রার্থনার সুফল

সংক্ষেপে বলা যেতে পারে যে, প্রার্থনার ফলে আমাদের জীবনে ঈশ্বরের অশেষ আশীর্বাদ ও অন্তরে গভীর প্রশান্তি লাভ করা যায়। সরলতা ও আন্তরিকতার সাথে প্রার্থনার ফলে একজন দুষ্ট মানুষ ভাল মানুষে পরিণত হয়ে যায়। তাই এই কথা বলা যেতে পারে: "প্রার্থনা করতে-করতে একজন হয় স্বর্গের দূত। প্রার্থনা না করতে-করতে একজন হয় নরকের ভূত।"

সাধ্বী মণিকার সুদীর্ঘ ও গভীর আন্তরিক প্রার্থনার ফলে তার বিধর্মী স্বামীর মনের পরিবর্তন হয়; তার অপব্যয়ী ও নষ্ট ছেলে আগস্টিন ভাল মানুষ হয়ে সাধুতে পরিণত হয়। আর তিনি নিজেও এই প্রার্থনার গুণেই একজন ধার্মিকা ও সাধ্বী নারীতে পরিণত হন।

সাধু আন্দ্রে যিনি মাত্র তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত পড়াশুনা করেছিলেন, তিনি কানাডা (উত্তর আরেমিকার) বিখ্যাত সাধুতে পরিণত হয়েছেন শুধুমাত্র তাঁর প্রার্থনাময় জীবনের জন্যে। তিনি একজন হলিক্রস ব্রাদার হতে পেরেছিলেন শুধুমাত্র তাঁর সুগভীর প্রার্থনাপূর্ণ জীবনের কারণে। একজন ব্রাদার হওয়ার পূর্বে ও পরে তিনি মন্ট্রিয়াল শহরের নটর ডেম কলেজের গেইটে দারোয়ানগিরি কাজের ফাঁকে-ফাঁকে অবসর সময়টুকু প্রার্থনা করে কাটাতেন। তাঁর প্রার্থনাপূর্ণ আশীর্বাদের গুণে দেশ-বিদেশের শত-শত অসুস্থ ব্যক্তি সুস্থ হয়ে ফিরে গেছেন-যার প্রমাণ রয়েছে মন্ট্রিয়ালের সাধু যোসেফের মহামন্দিরে - সুস্থ হয়ে ওঠার পর রোগিদের ফেলে যাওয়া কয়েক শত ক্রাচ্ - যা দিয়ে তারা পূর্বে হাঁটা-চলা করতেন।

আভিলার সাধ্বী তেরেজা একজন প্রার্থনাশীল বৃদ্ধা সিস্টারের প্রার্থনার গুণে দুষ্ট জীবন থেকে সৎ জীবনে ফিরে আসেন এবং নিজেও একজন প্রার্থনাশীল মরমী-সাধক ও ধ্যানী প্রার্থনাশীল মানুষ হওয়ার কারণে একজন বিখ্যাত সাধ্বীতে পরিণত হয়েছেন।

তাই একজন পণ্ডিত বলেছেন:

"যদি কোন পিতা-মাতার সন্তান নাস্তিক হয়ে যায়, হবে তার জন্যে দায়ী তার পিতা-মাতা।"

আসুন, আমরা প্রতিদিন যিশুর কাছে আসি। আসুন, প্রতিদিন পরিবারের সবাই মিলে ভক্তিভরে মায়ের পবিত্র জপমালা জপ করি এবং মা মারীয়ার সাথে প্রার্থনায় বসে যিশুর জীবন ও শিক্ষা ধ্যান করি; যিশুর পবিত্র নাম জপ করি এবং তাঁর অশেষ আশীর্বাদ লাভ করি। তাই আসুন, আপনার-আমার পরিবারের সবার প্রতিজ্ঞা হোক:

প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা
জপ্‌বো আমি মায়ের মালা।
ভক্তিভরে জপলে রে ভাই (২)
দূর হয় যত মনের জ্বালা।।
১। যে পরিবার জপে মালা
প্রতিদিন সন্ধ্যাবেলা।
নিত্য স্বর্গের শান্তি ঝরে (২)
পরিবারের সবার 'পরে।।
২। মায়ের মালায় কী যে জাদু
যে জপে সে জানে শুধু।
বিপদ-বাঁধা যায় দূরে যায় (২)
মায়ের মালার ভয়ে পালায়।।

নাজারেথের কুমারী: মারীয়া

ডোরা ডি'রোজারিও

গালেলিয়া প্রদেশের নাজারেথ শহরের এক কুমারীর নাম মারীয়া *(লুক ১:২৬ - ২৭)*। প্রজ্ঞাবানেরা অনেক চিন্তা-ভাবনা করেছিল কবে এই কুমারীর জন্ম হল, যদি তা জানা যেত! তারা ইতিহাস নথি ঘেটে-ঘেটে বুঝতে চাইলেন কোনভাবে প্রভু যিশুর জন্ম তারিখ বা সময় জানতে পারলে তবেই মারীয়ার জন্ম সালও জানা যাবে। তা খুঁজতে গিয়ে দেখা গেল সে যুগের ইহুদী জাতির মধ্যে বাগদানের নিয়ম বা বয়স নির্দিষ্ট ছিল। ঠিক আমাদের পূর্ব প্রচলিত প্রথার মত তাদের সমাজেও তেরো/চৌদ্দ বছর বয়সে অবিবাহিত মেয়েদের বাগদান পর্ব অনুষ্ঠিত হতো। বাইবেল বলে, মারীয়া এমনি বাগদত্তা ছিলেন যোসেফ নামে পরিচিত দায়ুদ বংশীয় একজনের সাথে *(লুক ১: ২৭)*। বাগদানের বয়স চিন্তা করে শাস্ত্রবিদরা মারীয়ার জন্ম সময় খুঁজে নিলেন। লুকলিখিত সুসমাচারে আরও জানা যায়, হেরোদের রাজত্বকালেই মুক্তিদাতা জন্মগ্রহণ করেন। তার রাজত্বকাল ছিল খ্রিস্টপূর্ব ৩৭-৪ অব্দ পর্যন্ত। আর এই হেরোদই নতুন রাজা অর্থাৎ যিশুর জন্ম সংবাদ পেয়ে বেথলেহেম ও তার নিকটবর্তী অঞ্চলের প্রায় দুবছর বয়সী পুরুষ শিশুদের হত্যা করে । তাহলে এ বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, শিশু হত্যার বছরখানেক আগেই যিশুর জন্ম হয়েছিল। এদিকে বেথলেহেমে শিশু হত্যার পূর্বেই তো পালক পিতা যোসেফ যিশু ও মারীয়াকে নিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল মিশরে। আর এই হত্যাকারী রাজা হেরোদ মারা গিয়েছিল ৪ খ্রিস্টপূর্ব অব্দে। এসব কিছুর নিরিখে গণিত হয় যিশুখ্রিস্টের জন্ম হয়েছিল খ্রিস্টপূর্ব ৭ বা ৬ অব্দে। মারীয়ার বাগদানের সময়কে সংযুক্তি রেখে হিসেব মতে মারীয়ার জন্ম হয়েছিল ১৯/২০ খ্রিস্টপূর্বে। রাজা হেরোদের মৃত্যু ও যিশুর জন্ম নিয়ে ইতিহাসবিদদের হিসেব মতেই খ্রিস্ট মণ্ডলীতে মারীয়ার জন্মদিন ৮ সেপ্টেম্বর সাব্যস্ত করা হয়। তাতে করে ষষ্ঠ শতাব্দী থেকে খ্রিস্টমণ্ডলীতে নির্মলা কুমারীর জন্মদিনটি পর্ব হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। কেননা স্বয়ং ঈশ্বর তারই গর্ভে নেমে এলেন, দৃশ্যমান হলেন। মারীয়ার জন্ম পর্বদিনে সাধু পিতর দামিয়েন তার উপদেশবাণীতে *(উপদেশ ৪৫)* মারীয়াকে স্বর্গরাজার গৃহ বলেছেন, যে গৃহটি সাতটি স্তম্ভের ওপর স্থাপিত। আর এই সাতটি স্তম্ভ হল পবিত্র আত্মার সাতটি দান। তাই মারীয়া সপ্তদানে অলঙ্কৃতা। মারীয়ার গর্ভ পবিত্রতম মন্দির।

নাম

পবিত্র মঙ্গলসমাচারে অনেকের নামই মারীয়া। তবে প্রভু যিশুর মা, মারীয়ার নামই বেশি সুখ্যাত। এটি একটি হিব্রু নাম মিরিয়াম, ইংরেজী ভাষায় ডাকা হয় মেরী। এই নামের অর্থ রাজকন্যা এবং শ্রদ্ধেয়া, স্বর্গদূত তাকে প্রসাদপূর্ণা বলেছিলেন *(লুক ১:২৮)*।

পিতা-মাতা

প্রাচীন জনশ্রুতি থেকে আমরা জানি কুমারী মারীয়ার বাবা ছিলেন দায়ুদ বংশজাত যোয়াকিম আর মা আন্না। মণ্ডলীর আচার্যগণ বলেন, মানত অনুসারে মারীয়া শিশু বয়সেই কুমারীত্বের ব্রত গ্রহণ করে মন্দিরে ঈশ্বরের সেবায় নিবেদিত থাকতে প্রতিশ্রুত হয়েছিলেন। তিনি মন্দিরে ধ্যান প্রার্থনায় রত থাকতেন।

শাস্ত্রে উল্লিখিত মারীয়া

এই কুমারী ঈশ্বর সেবায় নিবেদিত হবেন নাই-ই বা কেন। তার জন্ম তো পূর্বঘোষিত ছিল। শাস্ত্রে তো লেখাই আছে হবা যখন পাপে পতিত হল ঈশ্বর তখন প্রলোভনকারী সাপকে বললেন, 'আমি তোমার ও নারীর মধ্যে শত্রুতা জাগিয়ে তুলব, সেই নারী চূর্ণ করবে তোমার মস্তক *(আদি ৩:১৫)*। নাজারেথের এই কুমারীই সেই নারী। প্রবক্তাদের গ্রন্থে তেমনটি উল্লেখ আছে, এক যুবতী এখন সন্তান সম্ভবা, সে এক পুত্র সন্তানের জন্ম দিবে। সে তার নাম রাখবে ইম্মানুয়েল *(ইসাইয়া ৭:১৪)*। এই যুবতী, আসন্ন প্রসবা *(মিখা ৫: ১ ৩)* আর কেউ নন, মুক্তিদাতার জননী নাজারেথের কুমারী।

যিশু ও মারীয়া

প্রণাম তোমায়! পরম আশিসধন্যা তুমি! প্রভু তোমার সঙ্গেই আছেন *(লুক ১:২৮)*। স্বর্গ থেকে আগত গাব্রিয়েল দূত মারীয়াকে এই অভিবাদনের পর আরও বললেন, ভয় পেয়ো না, মারীয়া! তুমি পরমেশ্বরের অনুগ্রহ লাভ করেছ *(লুক ১:৩০)*। এসব কথা বলতে বলতে স্বর্গদূত আরও অদ্ভুত এক কথা বললেন যে, তিনি গর্ভধারণ করে এক পুত্রের জন্ম দিবেন, তিনি যেন তার নাম রাখেন যিশু। তিনি পরাৎপরের পুত্র বলে পরিচিত হবেন। অশেষ হবে তাঁর রাজত্ব *(লুক ১:৩১-৩৩)*। এমন কোন কুমারী আছেন যিনি এমন অসম্ভব, উদ্ভট কথায় বিচলিত হবেন না? কুমারী গর্ভবতী! এমন অবস্থায় ইহুদী সমাজ তাকে কী-ই না করতে পারে! অকস্মাৎ এমন সংবাদে মারীয়া বিচলিত হলেন তো বটেই, এক মুহূর্তে অসহায়বোধ করলেন, তবে প্রার্থনাসেবী এই কুমারী স্বর্গদূতের কথায় বিশ্বাসে আশ্বস্তও হলেন যে, পবিত্র আত্মা তাঁর ওপর অধিষ্ঠিত হবেন, পরাৎপরের শক্তিতে আচ্ছাদিত হবেন তিনি *(লুক ১:৩৫)*। অবাক বিস্ময়ে তিনি এলিজাবেথের বিষয়ে বলা কথাও উপলব্ধি করলেন। সাধু আগস্টিন বলেছেন, মারীয়া প্রভুযিশুকে গর্ভে ধারণের আগে অন্তরেই ধারণ করেছিলেন। তাই তো ঈশ্বরপুত্রের প্রেরণকর্মের সহযোগী হতে আন্তরিক সমর্পণের পরম বাধ্যতায় মারীয়া বলে উঠলেন ফিয়াৎ অর্থাৎ, আপনি যা বলেছেন, আমার তা-ই হোক *(লুক ১:৩৮)*। নাজারেথের মারীয়ার হ্যাঁ উচ্চারণে বাণী দেহগ্রহণ করলেন *(যোহন ১:১৪)*। মারীয়া হয়ে উঠলেন ঈশ্বরপুত্রের মাতা, যিশু অর্থাৎ মুক্তিদাতার মাতা, ঈশ্বরের মাতা। আসলে, মারীয়ার 'হ্যাঁ' উচ্চারণ এবং যিশুর হ্যাঁ উচ্চারণ, এ দুটো 'হ্যাঁ' উচ্চারণে আমাদের মুক্তি সাধিত হয়েছে। মারীয়া তাই মুক্তিকাজে সহযোগিনী। বাইবেলে এত কথা লেখা না থাকলেও একটু তলিয়ে দেখলে উপলব্ধি করা যায়, নাজারেথের মারীয়া বিশ্বাসের বাধ্যতায় সমর্পিতা হয়েছেন: বেথলেহেমের দরিদ্রতায়, মিশরের অভিবাসনে, মন্দিরে পিতার চরণে পুত্রকে উৎসর্গ করায়, নাজারেথের সহজতায়, বিবাহিত জীবনে কুমারীত্ব রক্ষণে, কিশোর ছেলেকে হারিয়ে ফেলার উদ্বিগ্নতায়, মঙ্গলবার্তা প্রচারে ব্যস্ত যুবক যিশুর অনুপস্থিতিতে, পিলাতের বিচারাসন থেকে সেই কালভেরীর পথে পথে মাকাবীয়দের মায়ের মত যিশুর অকথ্য যন্ত্রণা দর্শনে, পুত্রের শিষ্যের কাছে মাতৃত্ব গ্রহণে এবং অবশেষে পিতা তোমার হাতে আমার প্রাণ সঁপে দিলাম, যিশুর এই শেষ উক্তি পর্যন্ত, অবশ্যই কবরে শায়িত করা পর্যন্ত। এমন বাধ্যতার সমর্পণই পুনরুত্থান আনতে পারে। আর এনেছেও তা-ই, যিশু মৃত্যু পর্যন্ত বাধ্য হয়েছেন *(ফিলিপীয় ২:৮)*, পুনরুত্থিত হয়েছেন। সাধু ইরেনিউস বলেছেন, মারীয়া ও বাধ্যতার মাধ্যমে নিজের এবং সমস্ত মানবজাতির পরিত্রাণের কারণ হয়ে ওঠেছেন।

মারীয়া সকলের মা

সব কিছু দিতে-দিতে একেবারে নিস্ব, নিশেষিত যিশুর জন্য মাত্র বাকী ছিল তাঁর মা। পিতার হাতে প্রাণ সঁপে দেবার আগে তার শেষ সম্বল মাকেও দিয়ে দিলেন: মা, ওই দেখ, তোমার ছেলে! তারপর তিনি শিষ্যটিকে বললেন ওই দেখ, তোমার মা। *(যোহন ১৯:২৬)*। সব দিয়ে দেওয়ার কী বিস্ময়কর ঘটনা! সেদিন থেকে শুধু শিষ্যটির নয়, মারীয়া আমাদের সবার মা হলেন। সাধু এপিফানিউস মারীয়াকে 'জীবিতদের মাতা' বলে অভিহিত করেছেন।

যিশুর স্বর্গারোহণের পর, মাতৃত্বের দায়িত্ব নিয়ে শিষ্যদের ঘিরে রাখলেন তিনি। ভীত, আশাহত, আবার বিস্ময়াভূত তাদের সবাইকে সেই উপরের ঘরে আগলে নিয়ে, নিবিষ্ট চিত্তে প্রথম নবাহ প্রার্থনা শুরু করলেন *(শিষ্যচরিত ১:১২-১৪)* যেন পুত্রের সেই ফুঁৎকার, প্রতিশ্রুত সেই পরম আত্মা তাদের ওপরে নেমে আসেন। সত্যিই, নেমে আসলেন তিনি, খ্রিস্টমণ্ডলীর জন্ম হল। সকলের মা মারীয়া, খ্রিস্টমণ্ডলীর মাতা হলেন।

মা মারীয়া আমাদের কাছে কি বলেন? কি শিক্ষা দেন?

- মারীয়া আমাদেরকে দায়িত্বশীল সহযোগী হতে শিক্ষা দেন; তিনি যিশুর কথা শুনতে বলেন, উনি তোমাদের যা-কিছু করতে বলেন, তোমরা এখন তা-ই কর। *(যোহন ২:৫)*। কানা নগরে বিয়ে বাড়িতে বিশ্বাস ও আস্থা রেখে এ এক অভিনব মিনতি প্রার্থনা শিক্ষা দিলেন মারীয়া। অন্যের লজ্জা, অসহায় অবস্থা সরিয়ে দেবার স্নেহময়, এমন পদক্ষেপ নিতে যেন সচেতন থাকি।
- সেবাদাসীরূপে মারীয়া যুদেয়ার পার্বত্য অঞ্চলের পথ ভেঙ্গে বোন এলিজাবেথের ঘরে এলেন। পরম আত্মার শক্তি ও আনন্দে পূর্ণ হল তারা, এমনকি গর্ভের শিশুটিও। প্রভুর মাতা প্রভুকে বিশ্বাসীদের কাছে উপস্থিত করলেন। মা মারীয়া আমাদেরকে প্রভুর প্রতিশ্রুতিতে বিশ্বাস করতে শিক্ষা দেন যেন আমরাও জীবন দিয়ে তার পুত্র যিশুকে অন্যের সাক্ষাতে নিয়ে আসি।
- মারীয়ার প্রশংসাগীতি *(লুক ১: ৪৬-৫৫)* যিশুর মুক্তিদায়ী কাজে নিজেকে সম্পূর্ণভাবে সঁপে দেবার গীত। এতে মা মারীয়া আমাদের শিক্ষা দেন, যিশুর সাক্ষী হতে আমরা যেন আনন্দময় সাহস রাখি।

পরিশেষে বলতে চাই, অনন্যা, ধন্যা নাজারেথের এই কুমারী মায়ের কথা বলে কি শেষ করা যায়? পবিত্র আত্মায় পূর্ণা তিনি। আমাদের বিশ্বাসের তীর্থযাত্রায় তিনি অতুলনীয় আদর্শ, সবচেয়ে বেশি করে খ্রিস্টের অনুরূপ। যিশুকে ধারণ করতে যে, এই মাকেই সঙ্গে নিতে হবে-তিনি সাহায্যকারিণী, মঙ্গলকারিণী, মধ্যস্থতাকারিণী। এই উপলব্ধিতে বাংলাদেশে মিশনারী ফাদার তুরঞ্জণ সিএসসি একদিন এক লাইনের উপদেশবাণীতে বলেছিলেন, মাকে বাদ দিলে যিশুও চলে যায়। আর সাধু পুণ্যপিতা দ্বিতীয় জন পল বলেছেন, যিশুর মুখমণ্ডলের সৌন্দর্য ধ্যান করতে মারীয়ার শিক্ষালয়ে যেতে হয়।

প্রতিদিন যিশুময় হয়ে উঠতে এবং তাঁকে অন্যের কাছে প্রকাশ করতে নাজারেথের কুমারী মা মারীয়া আমাদের সঙ্গে থাকুন।

তথ্যসূত্র

১। *দ্বিতীয় ভাতিকান মহাসভা, খ্রিস্টমণ্ডলী বিষয়ক সংবিধান নং ৫৬, ৬২,৬৩*
২। *ফাদার জি আগস্টিন ও এন্টন সুব্রত মণ্ডল, ১৯৭৭ পুণ্যবতী মারীয়া*
৩। *মঙ্গলবার্তা ৩২*

স্বাস্থ্য ডিরেক্টরিতে নাম পাঠানোর আবেদন

এপিসকপাল হেলথ কমিশন, সিবিসিবি, বাংলাদেশের খ্রিস্টান ডাক্তার ও নার্সদের জন্য একটি স্বাস্থ্য ডিরেক্টরি তৈরি করতে যাচ্ছে। আপনি একজন গর্বিত এবং খ্রিস্টের সেবক/সেবিকা হিসেবে আপনার নাম, মোবাইল নম্বর, কর্মস্থলের নাম (যদি একই প্রতিষ্ঠানে অনেকজন কাজ করেন তাহলে একসাথে) আগামী ৩১ অক্টোবরের ২০২০ মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিদের মোবাইল বা ই-মেইলে পাঠানোর জন্য বিশেষ অনুরোধ করছি।

১. ডা: এডুয়ার্ড পল্লব রোজারিও, সেল: ০১৭৩০০৮২২৪১
dredwardprozario@gmail.com

২. আগ্নেস হালদার, প্রেসিডেন্ট, নার্সেস গিল্ড
সেল: ০১৬৮৭৩৪৭৮৭৯, agneshalder457@gmail.com

৩. ফাদার বাবলু সরকার, পরিচালক, ফাতেমা হাসপাতাল
সেল: ০১৭১৫০০৩১৪৭০, frbablukd@gmail.com

৪. লিলি এ. গমেজ, সেক্রেটারী, হেলথ কমিশন
সেল: ০১৭৩০০৮২২৪০, lilypmchnfp@gmail.com

বিপ/১৯৫/২০

ষোড়শ মৃত্যুবার্ষিকী

"ও যে মহা ঘুমে ঘুমিয়েছে
ডাকিস নে রে আর।
কান্না রেখে মহাযাত্রার পথ
করে দে সবার।"

বাবা,
আমাদের সকল কাজে,
সকল প্রার্থনায়,
তুমি থাকবে চিরকাল।

হিউবার্ট গমেজ
জন্ম: ২৮ জুন ১৯৪৪ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু: ২৬ অক্টোবর ২০০৪ খ্রিস্টাব্দ

পরিবারের পক্ষে,
সুপর্ণা এলিস গমেজ
এবং
পিউস রোজারিও

অপর্ণা এঞ্জেলি গমেজ, উপাসনা রুথ গমেজ, ফ্রাঙ্কলিন হিউ গমেজ
সঞ্জয় চার্লস গমেজ, জ্যোতি গমেজ, মায়া গমেজ ও জন গমেজ
ক-১১৬/১১/২, দক্ষিণ মহাখালী, গুলশান ঢাকা-১২১২

বিপ/১৯৩/২০

করোনাকালে শক্তিদানে জপমালা প্রার্থনা

সুনীল পেরেরা

আমার বয়স এখন ৭৭ বছর। বুকে দুটো রিং লাগানো। তাই কর্মক্ষেত্র থেকে শুরু করে পরিবারের সবার আকাঙ্ক্ষা আমাকে নিয়ে। বাংলাদেশে লকডাউন ঘোষণা দেওয়ার আগেই আমি গৃহবন্দী হয়ে গেলাম। তিন তলায় থাকি, নিচে নামাও নিষেধ। তখন কোয়ারেন্টাইন তেমন চালুই হয়নি, কিন্তু আমার বেলায় তাই হলো। সামান্য একটু সর্দি-কাশি ছিল। ওতেই আশঙ্কা এই বুঝি করোনায় ধরল। লণ্ডনে অবস্থানরত বড় পুত্রবধূ ডাক্তার, আবার তুমিলিয়াতে সিস্টারদের হাসপাতালে কর্মরত ডাক্তার সুধা আমার ভাগ্নি। দুজনেরই হুশিয়ারি কিছুতেই আমাকে বাইরে যেতে দেওয়া না হয়। ভাবটা এমন যে, একমাত্র আমি ছাড়া আর সবাই বাইরে গেলেও কিছু হবে না। সবাই আমাকে উপদেশ, নির্দেশ দিয়ে যাচ্ছে। এখন দুসময় তাই মানতেই হচ্ছে সব স্বাস্থ্যবিধি। এর মধ্যে যত ধরনের সাবধানতা এবং করণীয় সবই করা হচ্ছে। হোম ট্রিটমেন্টও চলছে। স্কুল কলেজ বন্ধ তাই মেজো বৌমা ইমা ও দুই নাতিকে নিয়ে বাপের বাসায় চলে গেছে তেজগাঁও রেলগেটে। বাজারে যাওয়া বন্ধ। ফেরিওয়ালারা ভ্যানে করে সবাই নিয়ে আসে। তিনতলা থেকে রশিতে ব্যাগ ও টাকা বেঁধে নামিয়ে দিলে মালামাল দিয়ে দেয়। শুধু চাল, ডাল, তেল, লবণ পাশের দোকান থেকে কিনে আনি। সরকারি লকডাউনের ফলে কিছুদিন অফিস আদালত বন্ধ থাকল। এক সময় ব্যবসা প্রতিষ্ঠানগুলো আস্তে-আস্তে খুলতে লাগল। মেজো ছেলে কনস্ট্রাকশন কোম্পানীতে চাকরি করে তাই তাকে অফিসে যেতেই হয়, অন্যথায় চাকুরি থাকে না। মার্চ থেকে জুলাই প্রায় পাঁচ মাস বন্দি জীবন কাটল। ঘরে বসেই খবরের কাগজ পড়ি আর লেখালেখি করি। সংক্রমণের ভয়ে এক সময় খবরের কাগজ রাখা বন্ধ করে দিলাম। দু'টো পূর্ণাঙ্গ নাটক আর একটা টেলিভিশন স্ক্রিপ্ট লিখে ফেললাম। করোনা নিয়ে লিখতে-লিখতে ২৪ পাতা ভরে ফেললাম।

বন্দী জীবনে হাঁপিয়ে উঠলাম। এসময় গাড়ি-ঘোড়া সীমিত আকারে চালু হলো। খোলা বাতাসে শ্বাস নেবার জন্য গ্রামে গেলাম অনেক দিন পরে। জুলাইয়ের ৫ তারিখে ফিরে এলাম। গ্রামে তখনও করোনা ছড়ায়নি তাই নিশ্চিত ছিলাম।

এরই মধ্যে খবর পেলাম মহামান্য কার্ডিনাল মহোদয় আর আর্চবিশপ মজেস কস্তা করোনায় আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন রয়েছেন। অগণিত ভক্তের প্রার্থনায় আর ঈশ্বরের আশীর্বাদে কার্ডিনাল মহোদয় সুস্থ হয়ে ফিরে এলেন। অনলাইনে খ্রিস্টযাগ শুনি রবিবারে। আর ঘরে বসে হোম ট্রিটমেন্ট তিনবার, বই পড়া আর লেখালেখি।

জুলাই মাসের ১৩ তারিখে আর্চবিশপ মজেস কস্তা সকল ভক্তদের শোকসাগরে ভাসিয়ে চলে গেলেন না ফেরার দেশে। তেজগাঁও ও তুমিলিয়াতে খ্রিস্টযাগ দেওয়া হলো, বিধি-নিষেধের কারণে যাওয়া হলো না। চট্টগ্রামে তার কর্মক্ষেত্রে তাকে সমাধিস্থ করা হলো হাজার-হাজার ভক্তের অশ্রুজলে। শোকে পাথর চাটগায়ের মানুষ। এমন মানবদরদী মানুষটা এত তাড়াতাড়ি এভাবে চলে যাবেন সেটা ভাবতেও কষ্ট হয়। ফুলের জলসায় কবরের অন্ধকারে সমাহিত হলেন আলোর পথের দিশারী। আমি হারালাম একজন সুহৃদয়কে। ভাওয়াল খ্রিস্টান যুবসমিতির ফুটবল টুর্নামেন্টের একজন তুখোড় ফুটবলার ছিলেন। তার বাবা আমার শিক্ষক ছিলেন। সব সময় বলতেন, "তুমিলিয়ার জন্য আমি কিছু করতে চাই।"

আর্চবিশপ মজেসের মৃত্যুর দিন থেকে মৃত্যুচিন্তা আমাকে ঘিরে ধরছে। দেহ-মন ক্রমেই যেন শিথিল হয়ে আসছে। ইতোমধ্যে, আমার স্ত্রী আর মেজো ছেলেও ক্লান্তিবোধ করছে।

১৭ জুলাই সেন্ট জন ভিয়ানী হাসপাতালে ফাদার কমল কোড়াইয়ার সাথে যোগাযোগ করলাম। তিনি রক্ত পরীক্ষার পরামর্শ দিলেন। সকালে তিনজনে রক্তের সেম্পল দিলাম। ১৮ জুলাই সকালে মহাখালি সরকারি হাসপাতাল থেকে ফোন করে জানানো হলো আমার তিনজনই করোনা ভাইরাসে আক্রান্ত। কাঁপতে-কাঁপতে সবাইকে দুসংবাদটা দিলাম। সে এক কঠিন মুহূর্ত। কি হবে এখন, কোথায় যাবো, কি করব? ঘরে ছোট বৌমা মিতুকে সবে মাত্র গ্রাম থেকে নিয়ে এসেছি। কদিন পরেই বিদেশ চলে যাবে। আর রয়েছে কাজের মেয়ে সাবিনা।

ডাক্তার পল্লবের সাথে দেখা করে আমার ছেলে তিনজনের জন্য একই ঔষধ নিয়ে এলো। 'ফেবিপিড়া' নামের একটা ঔষধ যার দাম ৪০০ টাকা, প্রতি জনকে ৭০টা করে ট্যাবলেট খেতে হবে। অন্যান্য ঔষধ তো আছেই। এগুলো শুধুই প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়ানোর জন্য, রোগ সারানোর কোনো ঔষধ তো আবিস্কারই হয়নি। দুদিন পরে বৌমা ও কাজের মেয়েটাকে ধরল করোনা।

জীবনে কত বড়-বড় সঙ্কট কাটিয়ে বেঁচে রয়েছি এত বছর, এবার বুঝি আর রক্ষা নাই। পালিয়ে বাঁচার পথ নেই। একমাত্র কবরই নিশ্চিত ও নিরাপদ। ঘরে ৫জনই সর্বদা স্তূপের মতো বিছানায় পড়ে থাকি। সবারই একই চিন্তা, একই ধ্যান মৃত্যু। কে রান্না করবে, কে বাজার করবে? ওদিকে ভয় কখন সরকারি লোক এসে লকডাউন করে দেবে। বড় তালা লাগিয়ে দেবে লোহার গেটে। পড়শীরা অন্য দৃষ্টিতে ভয়ে-ভয়ে তাকাবে আমাদের দিকে। এ যেন বেঁচে থেকেও জীবন্ত মৃত্যুর অভিজ্ঞতা।

২৩ জুলাই রাতে প্রচণ্ড শ্বাসকষ্ট দেখা দেয়। সেই সাথে জ্বর আর মাথা ব্যথা। ভোররাতে শ্বাস প্রায় বন্ধ হয়ে আসছে। মৃত্যু তখন দোঁড়গোঁড়ায়। কিন্তু মৃত্যু যে এত কষ্টকর তাই সিদ্ধান্ত নিলাম নিজেই চিষ্টা করে মরে যাই। অনেকক্ষণ শ্বাস বন্ধ করে মরতে চেষ্টা করলাম। এভাবেই মৃত্যুর সাথে আপোষ করেও যখন মরতে পারিনি, তখন ভাবলাম বেঁচে থাকতে হলে হাসপাতাল ছাড়া আর উপায় নেই।

২৪ তারিখে গ্রীন লাইফ হাসপাতালে ভর্তি করা হলো। দুইদিন মৃত্যুর সাথে লড়াই করে কোনমতে বেঁচে রইলাম। এরই মধ্যে আমার স্ত্রী পার্বতীকেও সমরিতা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। অগ্যাত আমাকে একই হাসপাতালে নেওয়া হলো।

স্বামী-স্ত্রী দুজনে পাশাপাশি দুটি কেবিনে পড়ে আছি, কেউ কাউকে দেখতে যেতে পারি না। ডাক্তার নার্সরা দূরে-দূরে দাঁড়িয়ে দুচার কথা বলেই চলে যায়। মনে হচ্ছিল, ছোঁয়াচে কুষ্ঠরোগিদেরও বুঝি এতটা অবহেলা করে না।

২৭ জুলাই থেকে ৭ আগস্ট পর্যন্ত সমরিতা হাসপাতালে ছিলাম। আমার স্ত্রী এক সপ্তাহেরও বেশি চিকিৎসার পর কোন পরিবর্তন না হওয়ায় ঘরে ফিরে যায়। আমি পড়ে আছি মৃত্যুর অন্ধকার ছায়ায়। এখানে আসার পর শুরু হয় ডায়রিয়া। দিনে-রাতে ৭-৮ বার পাতলা পায়খানা। রোজ একই সান্ত্বনা, সময় লাগবে সারতে। এখন আর করোনার কথা ভাবি না। বিছানা থেকে

ওয়াল ধরে-ধরে বাথরুমে যাই। কিছু খেলেও হয়, না খেলেও হয়।

এর মধ্যে স্বর্গ-মর্ত-নরক সবই দেখা শেষ। স্বর্গের দৃশ্য দেখলে বাঁচার সাধ জাগে। এখানেও একরাতে এমনই কষ্ট হচ্ছিল যে, অক্সিজেনেও কাজ হচ্ছে না। তখনই শ্বাস বন্ধ করে মৃত্যুর জন্য চেষ্টা করলাম। তারপর কি হলো মনে নেই। বোধহয় শ্বাস বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। ভোর রাতে স্বপ্ন দেখলাম যে, আমাকে মৃত্যুর পর নরকের আগুনে নিক্ষেপ করা হয়েছে। কিন্তু আমার কোনো কষ্ট হলো না। বুড়ো শয়তান রেগে গিয়ে অন্যদের ধমকাতে লাগল। বুঝলাম কোনো সমস্যা হয়েছে। একসময় আমাকে গলাধাক্কা দিয়ে পৃথিবীতে ছুড়ে ফেলে দিল। একজন করজোরে ক্ষমা প্রার্থনা করে জানালো, নাম বিভ্রাটের ফলে ওরা আমাকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল। চেহারা এবং নামের কারণে এমনটা হয়েছে।

নাকে অক্সিজেনের নল, মুখে মাস্ক পড়ে দিন-রাতের প্রহর গুনি। এখানে একমাত্র সান্ত্বনার উৎস মেট্রন লাকি দিদি আর আমার নার্স ভাগ্নি আলপনা। আমার সমস্ত কষ্ট তারাই উপলব্ধি করেছে। আলপনা মধ্যরাত পর্যন্ত আমার কেবিনে বসে থাকত। রাতের খাবার খাইয়ে, ঔষধ দিয়ে তারপর চলে যেত। তার সাথে হাসপাতালের ডাক্তারসহ সবাই আমাকে মামা বলে ডাকত। আমার রুমের সামনে এক চিলতে বারান্দা। রোজ সকালে একটা চড়ুই পাখি আমার ঘুম ভাঙ্গায়। কাচের আড়ালে লাফালাফি করত। একটা বিস্কুট দিলে পাখিটা খুশি হয়ে উড়ে যেত। একমাত্র ওকেই আমার বন্ধু মনে হতো। আত্মীয়স্বজন কেউ তো আসে না। করোনা নিয়ে আমার ছেলেই আসতো রোজ খাবার নিয়ে।

এরই মধ্যে ছোট বৌমা আর কাজের মেয়েটার অবস্থা আরও খারাপ হয়ে গেল। এক পরিবারে পাঁচজনই রোগি। কার সেবা কে করে?

রাতদিন সেলাইন আর ইনজেকশন চলছে। সাতটা ইনজেকশনের দাম ৪২ হাজার টাকা। প্রতিদিন কেবিন ভাড়া ৬ হাজার টাকা। ৪০০ টাকা দামের ৭০ টা'ফেবিপিড়া' তো আছেই। এ ছাড়া সিটিস্ক্যান, অন্যান্য ঔষধ ও সার্ভিস চার্জ তো আছেই। করোনার সেম্পল টেস্ট করা হলো দুইবার। এখানে ৪ হাজার টাকা করে লাগে। অথচ সেন্ট জন ভিয়ানী হাসপাতালে নেওয়া হচ্ছে মাত্র ৭০০ টাকা। করোনার সাথে-সাথে হাসপাতালগুলোও মানুষকে খুবলে খুবলে খাচ্ছে। বিছানায় শুয়ে-শুয়ে শুধুই টাকার শ্রাদ্ধ।

এতসব করার পরও আমার ডায়রিয়া বন্ধ হচ্ছে না। করোনার কষ্ট কিছুটা নিয়ন্ত্রণে এসেছে। তাই ৭ আগস্ট হাসপাতাল থেকে রিলিজ নিয়ে ঘরে এলাম।

ঘরে পাঁচজন রোগি। কেউ কারও মুখ দেখি না। মোবাইলে না হয় পর্দার আড়ালে কথা হয়। চারটি শোবার ঘর রোগি ও ৫ জন। অগত্যা আমরা স্বামী-স্ত্রী এক বিছানায় দুজনে দুদিকে মাথা দিয়ে থাকি। যেহেতু আমরা হাসপাতাল ফেরৎ রোগি তাই আমাদের জন্য ভিন্ন ব্যবস্থা। তখনও খাবার আসে বড় বৌমার বাপের বাড়ি আর আমার মেয়ের বাসা থেকে। যে খাবার নিয়ে আসে সে শ্বাস বন্ধ করে দিয়েই চলে যায়।

এর মধ্যে আমার স্ত্রী অনেকটা সুস্থ হয়েছে, কিন্তু আমার ডায়রিয়ার কোন হেরফের হলো না। হোম ট্রিটমেন্টে যা যা করণীয় সবই করছি। অবশেষে আইসিডিডিআরবি থেকে 'রাইস সেলাইন' এনে খেতে শুরু করি। এতেও কাজ হলো না। ভাবলাম করোনা আমাকে মৃত্যুর চ্যালেঞ্জ দিয়েছে। তবে কেন জানি মনে সাহস পেলাম এইভাবে যে, দু'বার মরার চেষ্টা করেও যখন মরতে পারিনি তাহলে আর মরব না।

ঘরে শুয়ে-শুয়ে আতঙ্কের মাঝে কেবলই শুনি শুধু সাইরেনের আওয়াজ আর অসহায় শোকার্ত লোকজনের ফোনালাপে স্বজন হারানোর কান্না। ভাবি, প্রকৃতিকে বিপন্ন করে আমরাইতো নানা রোগব্যাধির জন্ম দিচ্ছি। করোনা এর প্রতিশোধ নিচ্ছে প্রকৃতির বাহক হয়ে। বুঝলাম করোনা সহজে আমাদের ছাড়বে না। তাই দিনে রাতে তিনবার মালা প্রার্থনা করি, ক্রুশ ধরে কাঁদি।

এভাবে দুই মাস মৃত্যুযন্ত্রণা সহ্য করে হঠাৎ একদিন লক্ষ্য করলাম ডায়রিয়া বন্ধ হয়ে গেছে। মনে জোর পেলাম। এখন বাঁচার নতুন স্বপ্ন নিয়ে পথ চলছি। এভাবেই একে-একে সবাই যার-যার অবস্থানে থেকে সুস্থতা বোধ করতে লাগলাম। তাই আবার গেলাম সেন্ট জন ভিয়ানী হাসপাতালে। পাঁচজনের মধ্যে তিনজনের মধ্যে তিনজনের রেজাল্ট নেগেটিভ এলো। আমরা স্বামী-স্ত্রী তখনো পজিটিভ-এ রয়ে গেলাম। পরের বার আমি নেগেটিভ হলাম, আমার স্ত্রী পজেটিভ রয়ে গেল। চতুর্থবারে তার রেজাল্ট স্বাভাবিক হলো। অনেকদিন পরে দীর্ঘশ্বাস নিলাম। ধন্যবাদ দিলাম পরম করুণাময় ঈশ্বরকে। ঈশ্বর কতভাবেই যে আমাদের রক্ষা করেন ভাবলে অবাক লাগে। ঈশ্বর হয়তো পাপময় পৃথিবীকে ধ্বংস করে নতুন শান্তিময় পৃথিবী গড়ে তুলতে চান। যে বিশ্বে শুধু মানুষ নামের একটি জাতিই থাকবে এক রাজার অধীনে।

কত মানুষের প্রার্থনা আর সান্ত্বনার বাণীর ফলে মৃত্যুকে এবার জয় করতে পেরেছি। ছিল মনোবল আর আত্মবিশ্বাস। পালন করেছি স্বাস্থ্যবিধি। এখন ভাবি, আবার কবে মানুষ উদ্বেগহীনভাবে আনন্দে একে অন্যকে জড়িয়ে ধরবে, কবে মুখোশ খুলে মুক্ত বাতাসে প্রাণভরে নিশ্বাস নেবে। তবে নিশ্চিত যে, মানুষ আবারও নতুন পৃথিবীতে উঠে দাঁড়াবে নতুনভাবে, নতুন অভিজ্ঞতায়। কারণ, করোনা ভোগ ও জীবন-যাপনের ধরন সবই পাল্টে দিয়েছে।

অবশেষে বৌমা ফিরে এলো নাতিদের নিয়ে। ছোট বৌমা সুস্থ দেহে চলে গেল কানাডায়। আমরা এখন সবাই সুস্থ আছি। তবে এখনো পুরোপুরি স্বাস্থ্যবিধি মেনে চলছি।

প্রমাণ মারীয়া প্রার্থনাটি জপমালার প্রধান প্রার্থনা রূপে ব্যবহৃত হয়ে থাকে। বিপদের সহায়ক জপমালা প্রার্থনা। মা মারিয়া পবিত্র জপমালার রাণী। তিনি জগত্তারিনী, বিপদনাশিনী, দুঃখীদের, সান্ত্বনাদায়িনী। তিনি করুণার আঁধার, পাপীদের আশ্রয়, রোগিদের স্বাস্থ। বিপদে অসুস্থতায়, শোকে দুঃখে মা-মারিয়া আমাদের সান্ত্বনার উৎস, তিনিই আমাদের রক্ষা করেন।

মালা প্রার্থনার শক্তি অত্যন্ত কার্যকর। শোকে সঙ্কটে, বিপদে-অসুস্থতায় মালা প্রার্থনা আমাদের শক্তি, সান্ত্বনা ও অনুপ্রেরণা দান করে। এ প্রার্থনা আমাদের জীবনে আধ্যাত্মিক হাতিয়ার। মালা প্রার্থনার শক্তির কাছে পার্থিব সকল শক্তি পরাভূত হয়। মা মারীয়র কাছে প্রার্থনা করে কেউ ব্যর্থ হয়নি। মালা প্রার্থনার মধ্যদিয়েই আমরা সর্বদাই তার সন্তানদের স্নেহের আশ্রয়ে রাখেন। তার কাছে প্রার্থনা করা হলে তিনিই আমাদের সমস্ত প্রার্থনা ঈশ্বরের কাছে পৌঁছে দেন। তার মধ্যদিয়েই ঈশ্বর আমাদের সমস্ত বিপদ হতে রক্ষা করেন।

তাই আমি বিশ্বাস করেছিলাম, একমাত্র প্রার্থনা ছাড়া আমার আর কোন পথ নেই বেঁচে থাকার। সেই লক্ষ্যে সমস্ত মন-প্রাণ দিয়ে মা মারীয়ার মাধ্যমে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেছি প্রতিনিয়ত। আমার সুস্থতার জন্য প্রার্থনাই ছিল একমাত্র ভরসা। আমি বিশ্বাস করি সমস্ত মানুষের প্রার্থনার ফলেই আমি নিশ্চিত মৃত্যু থেকে রক্ষা পেয়েছি। রক্ষা পেয়েছে আমাদের পরিবারের পাঁচজন সদস্য, যারা একত্রে করোনায় আক্রান্ত হয়েছিল। কৃতজ্ঞতাভরে স্বর্গীয় মা-মারীয়াকে ধন্যবাদ দেই এবং সবাইকে আহ্বান করি পরিবারে নিয়মিতভাবে মালা প্রার্থনা করতে॥

ইতিহাস ঐতিহ্যে দুর্গাপূজা

শ্রী বিমল চন্দ্র চক্রবর্ত্তী

মা আনন্দময়ী আসছেন। আনন্দময়ীর আগমনবার্তা সবার মনে-প্রাণে শিহরণ জাগায়। বিত্তের অভাবে হয়ত নিজে পূজার আয়োজন করা যাবে না, তবু যেন কি আনন্দে প্রাণ ভরে ওঠে। মা আমার রাজকন্যা। সবার পক্ষে তাকে আবাহন করা সম্ভব নয়। তবু সবার মনে একই অনুভূতি, প্রাণ জুড়ানো আনন্দের অনুভূতি; মা আসছেন। এই আনন্দকে সবার মধ্যে ছড়িয়ে দেয়ার জন্যই আয়োজন শারদীয় সর্বজনীন দুর্গোৎসব। শরৎকালে অনুষ্ঠিত হয় বলে শারদীয়, সকলে মিলে পূজার আয়োজন তাই সর্বজনীন, মায়ের শক্তির আরাধনায় সকলে মিলে উন্নীত হওয়ার জন্যই দুর্গোৎসব।

দেবীর চালচিত্রেও দেখছি সকল দেবতা তথা সকল শুভশক্তি সমবেত হয়ে দশপ্রহরণধারিনী দেবী দুর্গা অশুভশক্তিকে (অসুর) দমন করে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করেছেন। ঐক্যবদ্ধ শুভশক্তির প্রতীকই হচ্ছে দেবীদুর্গা। একই শক্তি বিভিন্নরূপে প্রকাশিত হয়েছেন। শক্তিতত্ত্বের সূচনায় আমরা ঋগ্বেদ থেকে শুরু করে কেনোপনিষদের মধ্যে দেবী? হৈমবতি রূপে কেবল দেবতাদের নয় স্বয়ং দেবরাজ ইন্দ্রকেও শিক্ষাদান করেছেন। ব্রহ্মতত্ত্বকে উপলব্ধি করতে হলে শক্তির মাধ্যমেই তা করতে হবে, এ ব্যতীত অন্য কোন পথ নেই। ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণে 'শক্তি' বুৎপত্তিগত অর্থ ও মূল পাঁচটি শক্তির রূপ বর্ণনা করা হয়েছে। মার্কণ্ডেয় পুরাণ, মহাভারতের বিরাট পর্বে ও ভীষ্মপর্বে, কালিকা পুরাণ, মহাভাগবত, দেবী ভাগবত, মৎস্য পুরাণ, বৃহন্নন্দিকেশর পুরাণাদিতে দেবীর মহিমা কীর্তিত হয়েছে।

বেদের মহিমাময়ী শক্তি যিনি অম্ভৃণ ঋষির কন্যা বাকের মুখ দিয়ে ব্যক্ত করেছিলেন নিজের অপার মহিমা। তিনিই সেই আদি শক্তি, মহাশক্তি যিনি মার্কেণ্ডয় পুরাণোক্ত শ্রীশ্রীচণ্ডীর মধ্যে উচ্চকণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন, 'একৈ বাহং জগৎতত্র দ্বিতীয় কা মমা পরা'। মহাশক্তির প্রকাশকে বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনী বিভিন্নভাবে বিবৃত করেছে। তাই কখনো দেবী হয়েছে দশভুজা মহিষাসুরমর্দিনী দুর্গা, কখনো বা চামু-মু-মথিনি দেবী কালিকা, কখনও বা জগৎপালয়িত্রী দেবী জগদ্ধাত্রী কখনও বা অন্নদাত্রী অন্নপূর্ণা।

রামায়ণ, মহাভারত ও অষ্টাদশ পুরাণের মধ্যে আমরা অনেক বড়-বড় যজ্ঞাদির কথা জানতে পাই। কলিযুগে সবচেয়ে বৃহৎ যজ্ঞ হল দুর্গোৎসব। মনুসংহিতার টীকাকার কুল্লুকভটের পিতা উদয়নারায়ণ রাজশাহী জেলার তাহিরপুরের রাজপুরোহিত পণ্ডিত রমেশ শাস্ত্রীর পরামর্শক্রমে উদয়নারায়ণকে দুর্গোৎসব আয়োজন করার পরামর্শ প্রদান করেছিলেন। তারপরে কুল্লুকভট্টের পুত্র রাজা কংসনারায়ণ মোগল সম্রাট আকবরের রাজত্বকালে দুর্গোৎসবের আয়োজন করেছিলেন। চৈতন্যদেবের সমসাময়িক রঘুনন্দন 'তিথিতত্ত্ব গ্রন্থে 'দুর্গোৎসবতত্ত্ব' ও 'দুর্গাপূজাতত্ত্ব' নামে গ্রন্থ রচনা করেন। রঘুনন্দনের বয়োজ্যেষ্ঠ লিখেন 'দুর্গাচন কৌমুদী'। মিথিলার স্মৃতিকার পণ্ডিত বাচস্পতি মিশ্র (১৪২৫-১৪৮০) তার ক্রিয়া চিন্তামনিতে দেবীর মৃন্ময়ী প্রতিমা পূজার

পদ্ধতি বর্ণিত করেছেন। বৈষ্ণব কবি বিদ্যাপতি (১৩৭৫-১৪৫০) *'দুর্গাভক্তি তরঙ্গিণী'*, গ্রন্থে ১৪৭৯ খ্রিস্টাব্দ মৃন্ময়ী দেবীর পূজা পদ্ধতি বর্ণিত রয়েছে। রঘুনন্দনের গুরু শ্রীনাথের *'দুর্গোৎসব বিবেক'* গ্রন্থে বিদ্যাপতি দুর্গাপূজা, শূলপাণির (১৩৭৫-১৪৬০) 'দুর্গোৎসব বিবেক', 'বাসন্তী বিবেক' এবং 'দুর্গোৎসব প্রয়োগ' নামে তিনটি নিবন্ধ পাওয়া যায়। খ্রিস্টীয় ১১০০ শতাব্দীতে ভবদেব ভট্ট দুর্গাপূজার নির্দিষ্ট বিধি দিয়েছেন। জীমূতবাহনও তাঁর *'দুর্গোৎসব নির্ণয়'* গ্রন্থে মৃন্ময়ী দেবীপূজার কথা উল্লেখ করেছেন। এই সকল তথ্যাদির প্রেক্ষিতে বাংলাদেশ দশম বা একাদশ শতাব্দীতে দেবী পূজার প্রচলন ছিল বলে স্পষ্টত প্রতীয়মান হয়।

প্রচলিত অন্যান্য ধর্মমত থেকে সনাতন ধর্মে শক্তিবাদের চরম বিকাশ পরিলক্ষিত হয়। হিন্দু তন্ত্রশাস্ত্র অত্যন্ত বিশাল। এই তন্ত্রশাস্ত্রে শক্তি দর্শন বিশেষভাবে আলোচিত হয়েছে এবং শ্রীশ্রীচণ্ডীগ্রন্থ তার পূর্ণ পরিণতি। মহাসিদ্ধসার তন্ত্রমতে, পৃথিবীর প্রাচীনযুগে বিষ্ণুক্রান্তা, রথক্রান্তা ও অশ্বক্রান্তা এই তিন ভাগে বিভক্ত। অশ্বক্রান্তার অন্তর্গত সুদূর মিশরে মহিষাসুরমর্দিনী মূর্তি আবিষ্কৃত হয়েছে। শক্তিমঙ্গল তন্ত্রমতে, ভারতবর্ষও তিনভাগে বিভক্ত। বিন্ধ্যাচল থেকে চট্টলভূমি (চট্টগ্রাম) বিষ্ণুক্রান্তা, বিন্ধ্যাচল থেকে কন্যা কুমারিকা অশ্বক্রান্তা এবং বিন্ধ্যাচল থেকে নেপাল, মহাচীন রথক্রান্তা নামে বিখ্যাত ছিল। প্রতিটি ক্রান্তায় ৬৪ খানা তন্ত্র ছিল অর্থাৎ তৎকালীন সমগ্র ভারতবর্ষে ১৯২ খানা তন্ত্রশাস্ত্র ছিল। তন্ত্রশাস্ত্রের সার চণ্ডীর মধ্যে সন্নিবেশিত। তাই চণ্ডীগ্রন্থের গুরুত্ব সমধিক। শ্রীশ্রীচণ্ডী গীতার ন্যায় নিত্যপাঠ্য।

দেবী দুর্গা বৈদিক, তান্ত্রিক ও পৌরাণিক দেবতা সকল কিছুই। আধ্যাত্মিক জগতে তিনিই পরমেশ শক্তি পরমাপ্রকৃতি। অদ্বৈতবেদান্তে তিনি সগুণব্রহ্ম, অব্যক্ত ঈশ্বর। জ্ঞান ইচ্ছা ক্রিয়ার উন্মেষে তিনিই আবার হিরণ্যগর্ভরূপী প্রজাপতি ব্রহ্মা। বিরাটরূপে তিনিই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড রূপিণী। তাই দেখা যায়, কার্তিক গণেশের বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রদক্ষিণকল্পে শুধু মাকে প্রদক্ষিণ (গণেশ) করে বিশ্বব্রহ্মাণ্ড প্রদক্ষিণ সুসম্পন্ন করেন। দেবী বিশ্বমাতা। বিশ্বের সকল শিক্ষা ও সংস্কৃতি সম্পন্ন উন্নত দেশে বিশ্বমাতৃত্বের (Mother Goddess) ধারণা সুস্পষ্ট এবং প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের প্রত্নতত্ত্ববিদগণ এক কথায় স্বীকার করেন। বিশ্বমাতার ধারণা সমগ্র বিশ্বের সংস্কৃতিবান ও সভ্যতা সম্পন্ন দেশে ক্রমেই সমাদৃত হলো মনুষ্য সমাজ ও মনুষ্য জীবনে সুখ শান্তির কারণরূপে।

পরিশেষে প্রার্থনা জানাই, দেবী দশভুজা দশদিকের প্রতীক ও প্রকাশিকা, 'ত্রিভঙ্গস্থানসংস্থানাং'- ভুঃ ভূবঃ স্বঃ- পৃথিবীলোক, আকাশলোক ও স্বর্গলোকের প্রকাশিকা। 'মহিষাসুরমর্দিনী'- কামনাবাসনারূপ অজ্ঞান বা অবিদ্যানাশিনী, 'সিংহাসীনা'- তেজ ও বীর্যের প্রতীক, বরাভয়হস্তা ও কল্যাণকামিনী দেবী দুর্গা দুর্গতিনাশিনী; জ্ঞানরূপিণী সরস্বতী, ঐশ্বর্য ও সর্বমাধুর্যরূপিণী 'লক্ষ্মী'। সর্বসিদ্ধিদাতা বিঘ্ননাশক গণপতি, ত্যাগ ও শৌর্যের প্রতীক ও শান্তং শিবং অদ্বৈত মহাদেব শীর্ষে। দেবী বিচিত্ররূপে প্রকাশিতা; জগন্মাতা ও মহামায়া। যোগমায়া রূপে বিশ্বপ্রকৃতি ও সকল সৃষ্টির বীজরূপিণী। ত্রিনয়নী অর্থাৎ বর্তমান অতীত ভবিষ্যৎ যুগদৃষ্টিরূপিণী হে মাতা, তোমাকে ধ্যান করি, পূজা করি ও তোমার নিকট প্রার্থনা করি শ্বাশত কল্যাণ ও অমৃত জীবন॥

সর্বজনীন শ্রীশ্রী দুর্গাপূজা – ঐক্য শেখায়

গৌরমোহন দাস

বিশ্ববরেণ্য দার্শনিক ড. মহানামব্রত ব্রহ্মচারীজী বলেছেন, "ঈশ্বরের সহিত সম্বন্ধ পাতাইবার যত প্রকার উপায় মানুষ আবিষ্কার করিয়াছে, তন্মধ্যে পূজাই সর্বশ্রেষ্ঠ।" তাই তো, ঋতুর রাণী শরৎ এলেই মা আসছেন, মনে রব ওঠে যায়। আহা! কী আনন্দ আকাশে-বাতাসে! 'আনন্দধারা বহিছে ভুবনে'। আমরা আনন্দ নিয়ে মায়ের আগমন কামনা করি। কেন? আমাদের মাঝে ঐক্য থাকলে নিরানন্দ হওয়ার কারণ নেই। তাই প্রার্থনায় আমরা প্রণাম জানাই।

দুষ্ট প্রকৃতি বা অসুরদের অত্যাচারে পৃথিবী যখন অতিষ্ট। শান্তিপুরী স্বর্গ থেকে দেবতাগণ হন বিতাড়িত। কোনভাবেই তারা মুক্তির উপায় পাচ্ছিলেন না। তখন অসহায় দেবতাগণ ব্রহ্মা (সৃষ্টিকর্তা), বিষ্ণু (পালনকর্তা) ও মহেশ্বরের (ধ্বংসকর্তা) শরণাপন্ন হন। শেষে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও মহেশ্বর ত্রিশক্তির সম্মিলিত তেজরাশি থেকে এক নারীর আবির্ভাব হয়। তিনিই হলেন দেবী দুর্গা। নারীর আবির্ভাব কেন? মহিষাসুর, ব্রহ্মার নিকট থেকে বর লাভ করেছিল যে, কোন পুরুষশক্তি তাকে বধ করতে পারবে না। ফলে তাঁরা সৃষ্টি করেন এক নারীশক্তি দেবী দুর্গা। শব্দকল্পদ্রুম গ্রন্থমতে, দুর্গা নামের বিশ্লেষণ হলো : দ- দৈত্যনাশক, উ- বিঘ্ননাশক, (রেফ)-রোগনাশক, গ-পাপঘ্ন, আ-ভয় ও শত্রুনাশক। অর্থাৎ দৈত্য, বিঘ্ন, রোগ, পাপ, ভয় ও শত্রু হতে যিনি রক্ষা করেন তিনিই দুর্গা। মার্কন্ডেয় পুরাণমতে, দুর্গম নামক অসুরকে বধ করায় দেবীর নাম হয় দুর্গা। সকলের আর্তি বা বেদনা হরণ করেন "সর্বস্যার্তিহরে দেবি!" *(শ্রীশ্রীচন্ডী-১১/১২)*।

যখন মর্মার্থ বুঝি না তখন থেকেই দেখে আসছি বিভিন্ন সংগঠনের প্যাডের পাতায় শীর্ষে মুদ্রিত থাকে "ঐক্য শান্তি প্রগতি"। সত্যিই তো। তবে কথাগুলো সংগঠনের পাতায় থাকবে কেন? সংগঠন মানে বিভিন্ন অঙ্গের সংযোগ সাধন, একতা, ঐক্য, দলগত শক্তি বা মহাশক্তি। দলগত শক্তিতে শান্তি বিরাজ করে। আর যেখানে শান্তি সেখানে উন্নতি নিসন্দেহে। আমাদের সর্বজনীন মহোৎসব শারদীয় শ্রীশ্রী দুর্গাপূজা। সমাজের নীচু থেকে উঁচু শ্রেণির পেশায় নিয়োজিত সকলের অংশগ্রহণ থাকে এ পূজায়। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-নির্বিশেষে একসঙ্গে পূজায় মায়ের চরণে অঞ্জলি নিবেদন করে, সকলে আনন্দ উপভোগ করে। ঐক্যের পূজা শারদীয় দুর্গাপূজা। শারদীয়া মহোৎসবে দেবী আমাদেরকে ঐক্যের শিক্ষাদান করেন। কিভাবে? প্রথমেই নজর দেয়া যাক- মায়ের কাঠামোর দিকে। কাঠামোতে মায়ের সাথে আছে– সুর বা দেবশক্তি লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ, চালচিত্রে আছেন মঙ্গলকারী শিব; আছে অসুর শক্তি মহিষাসুর। মন্ত্রেও আছে– 'তিষ্ঠ দেবগণৈঃ সহ।' অর্থাৎ সকল দেবতাসহ তুমি পূজামণ্ডপে বিরাজ কর। শুধু তাই নয়, কুমার প্রতিমা গড়ে, পুরোহিত পূজা করান, নাপিত দর্পণ দেয়, মালী ফুল জোগায়, বাদ্যকর ঢাক বাজায় মানে সবার সম্পৃক্ততা থাকে দুর্গাপূজায়। শুভ বিজয়ায় উদার মিলন; মহামান্য রাষ্ট্রপতি, প্রধানমন্ত্রী থেকে শুরু করে সকলে উদারচিত্তে শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। সনাতন ধমাবলম্বীরাও সকল ধর্মমতের লোকজনের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় করে। ঐক্যের সুতায় এই উৎসব সকলের মিলন মেলায় পরিণত হয়। তাই এই উৎসব একটি সর্বজনীন ও জাতীয় উৎসব।

পবিত্র গীতায় (৪/১৩) শ্রীভগবান বলেছেন- চতুর্বর্ণ্যাং ময়া সৃষ্টং গুণকর্মবিভাগশ অর্থাৎ মানুষের গুণ ও কর্ম অনুসারে আমি ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চার শ্রেণিতে বিভাজন করেছি। যারা জ্ঞানচর্চা বা শিক্ষাদানে নিয়োজিত থাকে তারা ব্রাহ্মণ। যেমন : শিক্ষক। যারা রক্ষা কাজে নিয়োজিত থাকে তারা ক্ষত্রিয়। যেমন: সৈনিক। যারা ব্যবসা-বাণিজ্য বা কৃষিকাজে নিয়োজিত থাকেন তিনি বৈশ্য। যেমন: বিল গেটস। আর যারা সরকারি-বেসরকারি চাকুরি করেন বা অন্যের সেবায় নিয়োজিত থাকেন তারাই শূদ্র। সমাজের এই চার শ্রেণির সমাবেশ শ্রীশ্রী দুর্গা মায়ের কাঠামোতে। বিদ্যাদেবী সরস্বতী– ব্রাহ্মণ, দেবসেনাপতি কার্তিক- ক্ষত্রিয়, ধনদেবী লক্ষ্মী- বৈশ্য এবং গণপতি গণেশ হলেন শূদ্র। এই চারশক্তি একত্রে থাকলে সুশৃঙ্খল ও প্রগতিশীল সমাজ গঠন সম্ভব। লক্ষ্মী, সরস্বতী, কার্তিক, গণেশ, শিব পৃথক পৃথকভাবে তাঁদের পূজা করা হয়। ঐক্যের শিক্ষাতেই শ্রীশ্রী দুর্গা মায়ের সাথে তাঁদেরও পূজা করা হয়।

এবার নজর দেয়া যাক মায়ের সাথে পূজিত বাহনের দিকে। বাহন হিসেবে সিংহ, হাঁস, ময়ূর, পেঁচা, ইঁদুর ছোট-বড় বিভিন্ন প্রাণি রয়েছে। দেবী সকল দেবতার সম্মিলিত শক্তি, তাঁর বাহন সিংহ। আকৃতিতে বড়, সকল পশুর শক্তির প্রতীক পশুরাজ সিংহ। সুশ্রী ময়ূর কামরহিত। সমাজে অসুর স্বভাবের মানুষকে কাম থেকে বিরত থাকার শিক্ষা দেয়। কুশ্রী পেঁচা দিবান্ধ। যারা ঈশ্বরকে ভুলে লোভ-লালসায় মত্ত হয়ে অসৎ পথে অর্থোপার্জন করে তারাও সমাজের কুশ্রী। পেঁচা তাদেরকে অসৎ পথ থেকে বিরত থাকতে বলে। গজমুন্ড যার শিরোভূষণ তিনি হলেন গণেশ। গণেশ সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী বৃহৎ জীব হাতির মাথাকে শিরোভূষণ করেছেন এবং অতিশয় ক্ষুদ্র ও উপেক্ষিত ইঁদুরকে বাহন হিসেবে গ্রহণ করেছেন। দেখিয়েছেন বৃহতের সাথে ক্ষুদ্রের সমাবেশ। কারণ সমাজে কেউ আবহেলা/ফেলনা নয়। জনতার শক্তিই বড় শক্তি। তিনি বলছেন সমাজে উঁচু-নীচু, ধনী-দরিদ্র সকলেরই প্রয়োজন রয়েছে। জালে জড়ালে বড় জন্তুকেও মুষিক উদ্ধার করতে সক্ষম। তেমনি সমাজে বড় হতে হলে ছোটকে সঙ্গে নিয়েই বড় হতে হয়। সরস্বতীর বাহন হাঁস, অসারকে ফেলে সার গ্রহণ করে। দুধ ও জল মিশ্রণ করে দিলে হাঁস জল ফেলে শুধু দুধটুকু গ্রহণ করে নেয়। কিংবা কাদায় মিশ্রিত স্থান থেকেও তার খাদ্য খুঁজে নিতে পারে। মায়ের সাথে পূজিত হয়ে শিক্ষা দিচ্ছে– আমরাও যেন সকল অসার বা ভেজাল পরিহার করে সার বা ভাল কিছু নিয়ে সুন্দর পথে চলতে পারি। আবার বাহন- সিংহ, হাঁস, ময়ূর, পেঁচা, ইঁদুর, ষাঁড় ছোট-বড় প্রভৃতি প্রাণী দেবীর সাথে শোভিত হচ্ছে। কেন? কারণ প্রকৃতির সুরক্ষায় সে সব প্রাণীর ভূমিকা যেমনি অপরিসীম তেমনি সিংহ- ষাঁড়কে, ময়ূর- সাপকে, কিংবা পেঁচা-ইঁদুরকে দেখেও তেড়ে না এসে, হিংসা-বিবাদ ভুলে গিয়ে মায়ের আদর-শাসনে একত্রে রয়েছে; তারা আমাদেরও একত্রে থাকার শিক্ষা দিচ্ছে।

ষষ্ঠী থেকে দশমী তিথি পর্যন্ত ৫ (পাঁচ) দিনব্যাপী মহাসমারোহে শারদীয়া পূজা অনুষ্ঠিত হয়। এ পূজায় দ্রব্যসামগ্রী ব্যবহারেরও রয়েছে সর্বজনীনতা। পঞ্চ পল্লব, পঞ্চ শস্য, পঞ্চগব্য, ফুল, ফল, দূর্বা, তুলসী প্রভৃতি; সপ্তঘাটের জল থেকে শিশির কণা, দেবদ্বারের মৃত্তিকা থেকে বারবণিতার দ্বারের মৃত্তিকাসহ অনেক কিছু শ্রীশ্রী দুর্গাপূজায় লাগে। বারবণিতার মাটি কেন? বারবণিতারাও সমাজের একটি অংশ। রক্ষা করছে সমাজের বিশাল একটি অংশকে। তাদেরও সমাজে বেঁচে থাকার অধিকার আছে; আছে মায়ের পূজা করার অধিকার।

তাদেরকেও যেন অবহেলার দৃষ্টিতে না দেখা হয় এবং সমাজের ঐক্য তথা তাদেরকে মায়ের পূজায় সম্পৃক্ত করার জন্যই পূজায় বারবণিতার দরজার মাটি প্রয়োজন। সমাজে কেউ মাতৃপূজায় বঞ্চিত না হোক এমনটাই কামনা।

সপ্তমীপূজায় দেবীর পাশে সাদা কাপড়ে সাজানো থাকে নবপত্রিকা। সেখানে রয়েছে কৃষি সম্প্রসারণ তথা প্রকৃতি পূজার উপকরণ। কলা, কালোকচু, হলুদ, জয়ন্তী, বেল, ডালিম, অশোক, মানকচু, ধান নয়টি ঔষধি বৃক্ষের গুণাগুণ বিচার করে আর্য-ঋষিগণ ঐ বৃক্ষ পূজার বিধান করে দিয়েছেন। অজ্ঞতায় অনেকে এই নবপত্রিকাকে কলাবউ বা গণেশের বউ বলে থাকেন। যা মোটেও ঠিক নয়। অষ্টমীপূজায় শ্রীশ্রী দুর্গাপূজার অন্যতম অঙ্গ হলো কুমারী পূজা। কুমারী কন্যা নমস্য। কুমারী পূজার তাৎপর্য হলো- নারী দেবী বা শক্তির উৎস। মাতৃজাতিকে মায়ের আসনে অধিষ্ঠিত করার প্রয়াস-ই শ্রীশ্রী কুমারী পূজার আয়োজন। সকলের সে চিন্তাবোধ জাগ্রত থাকা উচিত।

সকল বর্ণের লোকজন ও সকল বস্তুর সমন্বয়ে শ্রীশ্রী দুর্গাপূজা। ঐক্যের পূজা। ঐক্যশক্তিতেই সৃষ্ট শ্রীশ্রী দেবী দুর্গা। পূজার সময় পুরোহিতের উপরে পূজার ভার ন্যস্ত করে অন্য কাজে রত না থেকে সকলে পূজামণ্ডপে বসে যেনো স্নান হোমাদি দর্শন করি। তাঁর পূজায় একতার শিক্ষা নিয়ে, প্রার্থনা করি– সকল আসুরিকতার বিনাশ হোক। পবিত্র বৈদিক মন্ত্রে আমরা বলি–সংগচ্ছধ্বং সংবদধ্বং সং বো মনাংসি জানতাম্‌।/দেবা ভাগং যথা পূর্বে সং জানানা উপাসতে।/সমানো মন্ত্র সমিতিঃ সমানী সমানাং মনঃ সহ চিত্তমেষাম।/সমানং মন্ত্রমভিমন্ত্রয়ে সঃ সমানেন বো হবিষা জুহোমি॥ (ঋগ্‌বেদ-১০/১৯১,২-৩) অর্থাৎ তোমরা সকলে এক সঙ্গে চল। এক চিন্তাধারায় স্নাত হয়ে সবে এক সঙ্গে বল। সকলে জান সকলের মনকে। ভালবাস সবাইকে। সকলের মন্ত্র, সংকল্প ও মন এক হোক, এক হোক, এক হোক॥

মণ্ডলীর বাণীপ্রচার সেবাকাজের জন্য ধর্মপল্লী সমাজের পালকীয় রূপান্তর

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

ধর্মপ্রদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য, বিভিন্ন কৃষ্টির মানুষের বসবাস, ইত্যাদি বিবেচনা করে ব্যবস্থা নিতে হবে। জনগণের সহযোগি ও অংশ হওয়া মানে হল একটি অভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিচিতির মধ্যে প্রবেশ করা। অর্থাৎ এইভাবে আমরা খ্রিস্টমণ্ডলীর সদস্য হিসাবে যাজক, নিবেদিত ব্যক্তিবর্গ ও ভক্তবিশ্বাসীগণ সকলে মিলে একটি সমন্বিত ও অংশগ্রহণকারী মণ্ডলী বা যিশুর দৃশ্যমান দেহ গড়ে তুলতে পারি। উপর থেকে ঐশ জনগণের বা খ্রিস্টবিশ্বাসী ভক্তদের ওপর কোন পরিকল্পনা চাপিয়ে দেওয়া ঠিক নয়। তাই এর জন্য ধর্মপ্রদেশ ও ধর্মপল্লীকে একটি পালকীয় পদ্ধতি অনুসরণ করে যাজক, ধর্মব্রতী ব্যক্তিগণ ও খ্রিস্টভক্তগণ সকলে মিলে একটি পালকীয় পরিকল্পনা তৈরী করবে, যা অনুসরণ করে ঐশরাজ্য বিস্তারের জন্য স্থানীয় ধর্মপ্রদেশের কার্যক্রম পরিচালিত হবে। রাজশাহী ধর্মপ্রদেশে এরূপ প্রক্রিয়া সক্রিয় রয়েছে-ভিকারিয়া ও ধর্মপ্রদেশ পর্যায়ে যে পালকীয় আলোচনা সভাগুলি অনুষ্ঠিত হয়, তা এই লক্ষ্য পূরণের জন্যই। তাছাড়া রাজশাহী ধর্মপ্রদেশের রয়েছে বাৎসরিক পালকীয় কর্মশালা যার মাধ্যমে প্রতি বছর এখানে বিশেষ মূলভাব নিয়ে আলাপ আলোচনা করে ধর্মপ্রদেশ ও ধর্মপল্লীগুলির জন্য কর্ম-পরিকল্পনা করা হয়। এই পরিকল্পনা প্রণয়নে যেমন ঘাস-মূলের অংশগ্রহণ রয়েছে, তেমনি রয়েছে এই পরিকল্পনা বাস্তবায়নেও তার অংশগ্রহণ। এই প্রক্রিয়ায় পবিত্র আত্মাই হচ্ছেন পথ প্রদর্শক ও চালিকাশক্তি। যাজকদের জীবন ও সেবাকাজ সম্পর্কিত পোপীয় পরিষদ কর্তৃক প্রকাশিত এই নতুন নির্দেশনা অনুসারে এইভাবে সকল ধর্মপ্রদেশ ও ধর্মপল্লীগুলি যেন পুনর্গঠিত হয় বা রূপান্তরিত হয় ও নতুন কাঠামো নিয়ে নতুন পদ্ধতি অনুসরণ করে ঐশজনগণ হয়ে উঠতে পারে- সেটাই নতুন এই নির্দেশনার লক্ষ্য॥

অংকিতা তুমি অঙ্কিতা আছো
স্বজন-বন্ধুর মাঝে
তোমার স্পর্শ সবখানেতেই
নিত্য সকাল-সাঁঝে।
নির্মল ছিলে মাগো তুমি
ছিলে চোখের মণি
আজো আছে সংসার জুড়ে
তোমার ছন্দের প্রতিধ্বনি।
কেনো এসেছিলে মাগো তুমি
ক্ষণিকের ধরাতলে
প্রেমের মায়ায় জড়িয়ে নিয়ে
কেনো চলে গেলে?

প্রয়াত অংকিতা মণিকা গমেজ
জন্ম : ১৯ জুন ২০০৫ খ্রিস্টাব্দ
মৃত্যু : ২০ অক্টোবর ২০১৮ খ্রিস্টাব্দ

অংকিতা,

প্রবাহমান সময়ের স্রোতে দিন পেরিয়ে, মাস গড়িয়ে আজ দুইটি বছর হয়ে গেল তোমার অনন্তলোক যাত্রার। আজ এই বিশেষ দিনে তোমায় যথাযোগ্য মর্যাদায় আমরা স্মরণ করি। তোমার রেখে যাওয়া স্মৃতি নিয়ে আমরা বেঁচে আছি। আমরা বিশ্বাস করি, স্বর্গ থেকে তুমি আমাদের জন্য প্রার্থনা কর যেন একদিন ঈশ্বরের গৃহে তোমার সাথে আমরা মিলিত হতে পারি।

শোকাহত,
বাবা - পংকজ গমেজ
মা - রুমা গমেজ
বোন - রেনেসা গমেজ
দড়িপাড়া পজুর বাড়ি

বিপ/১৮৭/২০

আর্থিক সাহায্যের জন্য আবেদন

আমি জিনিয়া রজিত, বর্তমানে আমি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের চতুর্থ বর্ষের দুটি প্রতিবন্ধী ছাত্রী। আমার বাড়ি কালিগঞ্জ উপজেলার মঠবাড়ী ধর্মপল্লীর ফেঁকুইবাড়ী গ্রামে, আমার বাবা সমর ও মা নন্দিতা রোজারিও আমাদের পরিবার খুবই হত দরিদ্র। আমার বাবা খুবই কষ্ট করে পরিবার এবং আমার পড়াশুনার খরচ চালায়। আমি বেশ কিছু দিন ধরে গুরুতরভাবে অসুস্থ, ডাক্তারি চিকিৎসা ও পরীক্ষার মাধ্যমে জানতে পারলাম আমি ব্লাড ক্যান্সারে আক্রান্ত। আমার চিকিৎসার জন্য অনেক টাকা প্রয়োজন। আমার চিকিৎসার খরচের আমার পরিবারের পক্ষে চালানো সম্ভব হচ্ছে না, তাই আমি আপনাদের নিকট আমার চিকিৎসার জন্য আর্থিক সাহায্যের হাত বাড়িয়েছি। আমি আমার মা-বাবাও সুন্দর পৃথিবী হারাতে চাই না। এই সুন্দর পৃথিবীতে বাঁচতে চাই। তাই আপনাদের কাছে সাহায্য কামনা করছি। আর্থিকভাবে আমাকে সাহায্য করে আমার পাশে থাকার জন্য আমি আপনাদের কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকব।

জিনিয়া রজিত
মঠবাড়ি ধর্মপল্লী, কালিগঞ্জ গাজীপুর

সাহায্য পাঠানোর ঠিকানা

মো: ০১৭৬২৫১৬৬৬৬ (বিকাশ)	ফাদার উজ্জল লিনুস রোজারিও পাল-পুরোহিত মঠবাড়ী ধর্মপল্লী উলুখোলা, কালীগঞ্জ, গাজীপুর। মোবাইল: ০১৭১৫-৭৬০৬৬৫ uzzalrozario@gmail.com
মো: ০১৭৩২৭৯৬১৮০ (জিনিয়া রজিত)	

দেবী দুর্গার গুণাবলী থেকে নেতৃত্বের কিছু শিক্ষা

ড. ফাদার তপন ডি' রোজারিও

মাতৃদেবী দুর্গা সনাতন ধর্মের সবচেয়ে বড় দেবী। তিনি আবির্ভূতা হয়েছিলেন ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিবসহ সকল দেবতার সমন্বিত শক্তি নিয়ে। বলা হয় যে, মাতৃদেবী দুর্গা এই সৃষ্টি, স্থিতি আর লয় দেবতাত্রয় থেকেও শ্রেষ্ঠা। তিনি দশভূজা- তার দশটি হাতে ধারণ করে আছেন এক একটি বিশেষ অস্ত্র বা হাতিয়ার। তিনি ত্রিনয়নী-তার নয়নের অগ্নিশোধিত দৃষ্টিতে গোটা মুখাবয়ব বিশুদ্ধ। ঠোঁটে তার রহস্যঘেরা মিষ্টি হাসি। তার বাহন পশুরাজ সিংহ। তিনি পরিপূর্ণ শক্তির নিখাঁদ সংমিশ্রণ আর অনন্য মহানুভবতার আধার।

পৌরাণিক কাহিনীতে বলা হয়েছে যে, যখন কোন দেবতা বা ভগবান 'মাহিশাসুর' (মহিষ দানব) শক্তিকে কোনভাবেই জয় করতে পারছিল না তখন সকলে মিলে দেবী পার্বতীর নিকট রক্ষা প্রার্থনা করেছিল। অতপর কাতর সেই প্রার্থনা শ্রবণে দুর্গাকে সৃষ্টি করা হলো অজেয় মহিষাসুরকে হত্যা করতে আর শান্তি, সমৃদ্ধি আর শুভ ধর্মকে ভয়-ভীতি প্রদর্শনকারী সমূদয় মন্দতা আর শয়তানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করতে। মা পার্বতী যখন সহজ-সরলা, মধুময়ী, রক্ষাকারিণী আর দয়াবতী দেবী হিসেবে বিবেচিত, দুর্গা তখন এক ভয়ঙ্করী দেবী- ভ্রান্তি আর মন্দতাকে কখনোই তার ক্রোধের সর্বশেষ আঘাত না দিয়ে পশ্চাদপদ হন না।

দেবী দুর্গার প্রতিমা পূজা করা হয় তার ন্যায়পরায়ণতা, ক্ষমতায়ন ও পরিত্রাণের নিমিত্তে। তিনি আবির্ভূতা হন একক ও স্বাধীন দেবী হিসেবে- আর এই জন্যই তার প্রতিমা যুগে-যুগে, কালে-কালে অনন্য অনুপ্রেরণার প্রতিমা। কোটি ভক্তের ভাব, ভাবনা ও ভক্তির দারুণ সব শৈল্পিক, নান্দনিক প্রকাশ অভিব্যক্তি আর সময় উপযোগী উপস্থাপন লাখ-লাখ মণ্ডপে। পূজামণ্ডপে প্রবেশ করে ভক্ত যখন আকর্ষিত হয় নানা আকর্ষণীয়-চটকদারী বিষয়বস্তুতে, তখন অনেকেই আবার মায়ের পুণ্য-পবিত্র গুণাবলী স্বীয় জীবনে ধারণ করে বড় নেতা-নেত্রী হতে মনোবাসনা পোষণ করে, আনত বিশ্বাসে মানত পূরণও করে থাকে।

বৈশ্বিক মহামারী কভিড-১৯ কালে উদ্‌যাপিত দুর্গাপূজা নিয়ে এসেছে ভিন্ন পরিমাত্রা। মানব ঘাতক অতি মন্দ জীবাণু করোনা বিনাশ করে তিনি মানবজাতি ও মানবিকতাকে রক্ষা ও উন্নীত করবেন। এছাড়াও আমরা আরও ভাল ও সফল জীবনের জন্য মা দুর্গার কাছ থেকে বেশ কিছু নেতৃত্বের গুণাবলী শিখে নিতে পারি।

১। জীবন দর্শন সুস্পষ্ট আর কেন্দ্রিভূত রাখা: পূজা মণ্ডপে গেলে পর দেবী-প্রতিমা দর্শনে যে জিনিসটি প্রথমেই একজনকে আকৃষ্ট করে তা হলো তার মায়াবী দৃষ্টি, মুগ্ধতার এক বিশেষ আকর্ষণ। এই মৃদু বা মুচকী হাসি দেখায় যে, জীবন অবস্থা যত কঠিন বা ভয়ঙ্কর হোক না কেন-সেই পরিস্থিতিতে তুমি অবশ্যই নিজেকে সবসময় শান্ত ও স্থির রাখবে। মা দুর্গার চিত্রিত বিস্তীর্ণ নয়নযুগল সুস্পষ্টতা আর ফোকাসড্ থাকার জীবন দর্শনকেই প্রকাশ করে। তোমারও থাকতে হবে জগত ও সমাজে বিরাজমান মন্দতার দিকে সদা সতর্ক বা চিরজাগ্রত দৃষ্টি, জগতে যাপিত জীবনের মুখোমুখি যত অসুর তা পরাজিত বা পরিহার করে সেবা কর্ম করে যেতে হবে। তবে ক্ষুদ্র এ মানব জীবনে তুমি কোথায় পৌঁছাতে চাও তা-ও অবশ্যই জানা থাকতে হবে।

২। তোমাকেও তোমার জীবনে বিভিন্ন ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে হবে: যদিও বা দেবী দুর্গা সবার থেকে বড় তথাপি নবরাত্রিতে, তিনি অবির্ভূতা হন নয়টি ভিন্ন-ভিন্নরূপে। নয়টি রূপভেদ ও ভাবভেদ হলো: স্কন্দমাতা, কুষ্মাণ্ডা, শৈলপুত্রী, কাত্যায়নী, কালরাত্রি, মহাগৌরী, ব্রহ্মচারিণী, চন্দ্রঘন্টা আর সিদ্ধিদাত্রী। শিক্ষাটি কিন্তু খুবই সহজ-সরল, একজন নেতা বা নেত্রীকে অবশ্যই জানতে হবে কখন কোন পরিবেশে কী করতে হবে কি গুণ দিয়ে! তুমি তোমার মত হবে- এটি চিরন্তন, তবে পরিবেশ অনুযায়ী নতুন বাচন, ধরণ, রীতি, আচার-আচরণ বা উন্নতর মনোভাব-সূচক ভঙ্গি অবলম্বন করতে সদা প্রস্তুত থাকতে হবে।

৩। অপরের কাছ থেকে ভাল কিছু শিখে নেওয়া একটি পরম সুখ: কাহিনী যেমন বলে, দুর্গা সৃষ্ট হয়েছিলেন ব্রহ্মা-বিষ্ণু আর শিবের শক্তি সংগ্রহের পর বিবিধ জগতকে রক্ষা করার জন্য। যে নীতিগত শিক্ষা আমরা এখান থেকে পাই তা হলো, একজন ভাল নেতা এমনি একজন ব্যক্তি যিনি জানেন শিক্ষালাভের ক্ষমতা। যদি জীবনে তোমার একটি উদার-উন্মুক্ত মন থাকে আর যদি জীবনে শিক্ষালাভের মনোভাব বা ইচ্ছা থাকে, তবে তুমি জীবনে যে কোন কঠিন বাস্তবতাকে জয় করতে পারবেই পারবে।

৪। নির্ভীক ও শক্তিশালী হও: দেবী দুর্গার গোটা অস্তিত্বটাই তোমার তেজোময় শক্তি আর ভয়-ভীতি জয় করার বিষয়ে। দেবী ধারণ করে আছেন অনড় অন্তস্থিত শক্তি বা তেজ। তিনি নারী যোদ্ধা অথচ সিংহে আরোহণ করেন, যার অর্থ তুমি যদি অধ্যবসায়ী হও, তবে তুমিও তোমার জীবনের যে কোন সমস্যা-বিপদ-মন্দতাকে বশ করতে পারবে। তোমাকে শুধুমাত্র নিজের ওপর বিশ্বাস রাখতে হবে- আর বিদূরিত করতে হবে হাল ছেড়ে দেওয়ার মানসিকতা কেননা কখনো-কখনো কাঙ্ক্ষিত সাফল্য আসে দীর্ঘ সময় অন্তে।

৫। বহুমুখী কর্মী হও: দুর্গার দশটি বাহু বহুমুখী কাজের প্রতীক প্রকাশক। তুমি যদি ভাল নেতা-নেত্রী হতে চাও তবে তোমারও জানা উচিত যে কীভাবে একই সময়ে একটির বেশি কাজ সমাধা করতে হয় কারণ এতে শুধু কিছু সময় বা মিনিটই বাঁচবে না, বরং তোমার ব্রেইনও এ্যকটিভ থাকবে। তুমি যদি বহুমুখী কাজ করার শিল্প রপ্ত করতে পার, তবে কখনো কোনভাবে সময় আর সম্পদ দৈন্যতায় ভুগবে না।

দেবী দুর্গা আমাদের শেখান যে, শক্তি-ক্ষমতা স্বাধীন আর সমস্যা-সঙ্কট, দুঃখ-কষ্ট বা বিপদে-আপদে কাউকে না কাউকে দায়িত্ব নিতেই হয়। তিনিই একমাত্র দেবী যিনি আর কোন পুরুষ বা নারী দেব-দেবীর সাথে সংযুক্ত নন। তার নিজেরই আছে অনুসারী আর তার অনুপ্রেরণার দৈবিক জীবন ও কর্ম লক্ষ-কোটি মানুষকে দেয় শক্তি-সামর্থ, দেয় বিপুল অনুপ্রেরণা। তুমি তার অনুসারী বা অনুসারী নও এতে কিছু আসে যায় না, বরং তুমি যদি জীবনে এই কয়েকটি শিক্ষা চর্চা ও প্রয়োগ করতে পার, সন্দেহ নেই তুমিও অনেক বড় মাপের নেতা-নেত্রী হতে পারবে আর অপরকেও পথ দেখাবে প্রত্যাশার সমাজ ও জগত বিনির্মাণে।

দুর্গাপূজা প্রসঙ্গে দার্শনিক গোবিন্দ চন্দ্র দেব বলেন: "দুর্গাপূজার মধ্যে যে অসীম শক্তি আর বিশ্বপ্রেমের ধারণা রয়েছে তার সঠিক চর্চা ও অনুশীলনই আমাদের এই ক্রান্তিলগ্ন থেকে মুক্তি দিতে পারে, আর উপহার দিতে পারে একটি সুখী-সুন্দর বাসযোগ্য পৃথিবী। এই পৃথিবীতে তখন আর থাকবে না দ্বন্দ্ব-কলহ, হিংসা-বিদ্বেষ, জাতিতে-জাতিতে সংঘর্ষ, সাম্প্রদায়িকতা। এই পৃথিবীতে থাকবে মানুষের মানবীয় গুণাবলি।" দুর্গাপূজাকে এই ব্যাপক মানবিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে দেখা আমাদের একান্ত প্রয়োজন বলে মনে করি। তাহলেই দুর্গাপূজা হবে সার্থক। এখানে ধর্ম, বর্ণ, গোত্রের কোনো ভেদাভেদ নেই। শারদীয় এই উৎসবের বহুমাত্রিকতা শুধুমাত্র ভক্তি আর আরাধনার গণ্ডি পেরিয়ে আবহমান বাংলায় সত্যিকার সর্বজনীনতায় পরিণত হয়েছে॥

মণ্ডলীর বাণীপ্রচার সেবাকাজের জন্য ধর্মপল্লী সমাজের পালকীয় রূপান্তর

বিশপ জের্ভাস রোজারিও

যাজকদের সেবাকাজ সম্পর্কিত পোপীয় পরিষদ (ভাতিকান) ২৭ জুন ২০২০ একটি নির্দেশনা প্রকাশ করেছে, যার নাম হল "ধর্মপল্লী সমাজকে খ্রিস্টমণ্ডলীর বাণীপ্রচার সেবাকাজে পালকীয় রূপান্তর"। এর আলোকে আমরা একটা বিশ্লেষণ করতে পারি। "মরুভূমিতে যাত্রাকালে ইস্রায়েল জাতির লোকেরা যেমন ঈশ্বরের মণ্ডলী বলে আখ্যায়িত হয়েছিল, ঠিক তেমনি ভবিষ্যত ও নিত্যস্থায়ী আবাস-সন্ধানী বর্তমান যুগের 'নতুন ইস্রায়েল জাতিকে খ্রিস্টের মণ্ডলী বলা হয়" *(খ্রিস্টমণ্ডলী ৯, ২য় ভাতিকান)*। সে এমনই এক জনমণ্ডলী যা ঈশ্বর নিজেই গঠন করেছেন, "যারা যিশুকে বিশ্বাস সহকারে ত্রাণদাতারূপে এবং একতা ও শান্তির উৎস হিসাবে গ্রহণ করেছে, ঈশ্বর তাদেরকে একত্রে সম্মিলিত করে মণ্ডলীরূপে গঠন করেছেন যেন প্রত্যেকের এবং সকলের জন্য সে পরিত্রাণদায়ী মিলনের নিদর্শন হয়ে উঠতে পারে" (উপরোক্ত)। ইতিহাস ও সময়ে বসবাস করে সে খ্রিস্টের কাছ থেকে প্রাপ্ত পরিত্রাণের সেবাকাজে অংশগ্রহণ করে যায়। এই ঐশজনমণ্ডলীর সদস্যরা প্রত্যেকে ঈশ্বরের আহ্বানে সাড়া দিয়ে যার-যার মত খ্রিস্টমণ্ডলীর বিভিন্ন কল্যাণমূলক সেবাকাজে অংশগ্রহণ করে ও দায়িত্ব পালন করে থাকে।

তাই ঐশজনগণই বাণীপ্রচার কাজ করে থাকে, আর তা তারা করে যার-যার ঐশ আহ্বান, জীবন অবস্থান, পরিপার্শ্বিক অবস্থা অনুসারেই। মণ্ডলীর আইন শাস্ত্রে *(৫১৫ § ১)* "ধর্মপল্লী"র একটি ধর্মতাত্ত্বিক সংজ্ঞা দেওয়া হয়েছে এইভাবে-ধর্মপল্লী হ'ল "খ্রিস্টবিশ্বাসীদের একটি সমাজ" যাদের রয়েছে বিভিন্ন প্রকার ঐশ আহ্বান, যেমন যাজক, ডিকন (পরিসেবক), নিবেদিত জীবনের ব্যক্তিগণ, খ্রিস্টভক্ত জনগণ, বিভিন্ন সংঘ ও পরিবার, যাদের সকলেই কোন না কোনভাবে ধর্মপল্লীর পালকীয় কাজে অংশ নিয়ে থাকে। এই সকল কাজের দায়িত্ব পালক পুরোহিতের উপর ন্যস্ত, কিন্তু তিনি তা সম্পন্ন করেন উল্লিখিত সকলের সহযোগিতায় ও অংশগ্রহণে। "নিগূঢ় খ্রিস্টমণ্ডলী" নামক নির্দেশনায় (১৫ আগস্ট) ১৯৯৭) পাল-পুরোহিতের পালকীয় দায়িত্ব পালনে খ্রিস্টমণ্ডলীর সকল সদস্যের অংশ গ্রহণের কথা বলা হয়েছে; আর যাজকদের সেবাকাজ সম্পর্কিত পোপীয় পরিষদ "ধর্মপল্লী সমাজের যাজক, পালক ও নেতা" দলিলে একই নির্দেশনা দিয়েছে *(৪ আগস্ট ২০০২)*। উভয় নির্দেশনাতেই খ্রিস্টমণ্ডলীর একই বাণীপ্রচার সেবাকাজের বিভিন্ন পরিস্থিতি ও ধরণের কথা বলা হয়েছে যা আজ একটি বাস্তবতা। বর্তমান দলিলে ধর্মপল্লী সমাজকে রূপান্তরের যে রূপরেখা বর্ণনা করা হয়েছে, সেখানে আমাদের স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, খ্রিস্টমণ্ডলীতে সকলের স্থান রয়েছে, আর সকলেই সেখানে স্থান পেতে পারে। তবে মণ্ডলীর কিছু অতিরঞ্জিত মনোভাব, যেমন খ্রিস্টভক্তদের যাজক মনোভাবাপন্ন হওয়া, যাজকদের সংসারী মনোভাবাপন্ন হওয়া, বা ডিকনদের আধাযাজক বা সুপার খ্রিস্টভক্ত মনে করার মত বিষয়গুলির কোন অবকাশ এখানে নেই। এই দিক থেকে বিবেচনা করলে এই নতুন দলিলে নতুনত্ব কিছু নেই। নির্দেশনাগুলি সেই পূর্ববর্তী দলিলগুলিতেই প্রকাশিত হয়েছে।

এই নির্দেশনার উদ্দেশ্য হল কিছু পালকীয় পদ্ধতি যার অনেক কিছু) ইতোমধ্যেই ধর্মপল্লীর পালকগণ বাস্তবায়ন করেছেন। ধর্মপল্লীর খ্রিস্টভক্তগণ ইতোমধ্যেই নতুন পালকীয় পদ্ধতি সাদরে গ্রহণ করেছে এবং সেই অনুসারে তাদের অবদান রেখে চলেছে। তবে এইসব নতুন পালকীয় পদ্ধতি কতটা ঠিক বা ঠিক নয় তা অবশ্যই বিবেচনা করে দেখতে হবে; আর যদি ঠিক না হয় প্রয়োজনে তা সংশোধন করতে হবে-এই নতুন নির্দেশনা সেই কথাই বলে। তাছাড়া ভবিষ্যতের পালকীয় পদ্ধতি কি হবে তার ভিত্তিও রচনা করতে হবে। খ্রিস্ট নিজে মণ্ডলীকে দায়িত্ব দিয়েছেন মিশনারী হতে, বাণীপ্রচার করতে আর বাহ্যিকভাবে সাক্ষ্যদান করতে; আর তাই এর কাঠামোতে অব্যাহত নবায়ন ও পুনর্গঠন আনা দরকার যেন সে বর্তমান সময়ের চ্যালেঞ্জসমূহ মোকাবেলা করতে পারে। স্বাভাবিকভাবেই তাই দেখতে হবে যে, পালকীয় পদ্ধতি অনুসরণ করে পালকীয় যত্ন দেওয়া হয়, তাতে খ্রিস্টে দীক্ষিত সকল ভক্তের সমান অংশগ্রহণ আছে কিনা। ২য় ভাতিকান মহাসভা থেকে শুরু করে বর্তমানে পোপ ফ্রান্সিস পর্যন্ত মণ্ডলীর সকল শিক্ষামালায় ধর্মপল্লী সমাজ ও পালকীয় সেবার যে দর্শন প্রকাশিত হয়েছে তা শুধু একটি মতামত নয়, বরং তা আমাদের বাস্তব জীবনে অনুসরণ করার জন্যও বটে। আমরা দুটি চরমাবস্থার কথা চিন্তা করতে পারি: একদিকে রয়েছে এমন সব ধর্মপল্লী যেখানে পাল-পুরোহিত ও অন্যান্য পুরোহিতগণ সকল সিদ্ধান্ত ও পালকীয় সেবার ব্যবস্থা করেন- সেখানে অন্যান্য দীক্ষিত বিশ্বাসী ভক্তগণ শুধু পুরোহিতগণের আদেশ নির্দেশ পালন করে। আবার অন্যদিকে রয়েছে তারা, যারা পোষণ করে গণতান্ত্রিক মনোভাব। যার ফলে, তারা মনে করে ধর্মপল্লীতে কোন কর্তৃত্বপূর্ণ পালক পুরোহিতের দরকার নেই, তিনি হবেন এমন একজন ব্যক্তি যিনি অন্যদের মতই- যাজক বা খ্রিস্টবিশ্বাসী ভক্ত- শুধু তাঁর নিজের উপর অর্পিত কাজটুকুই করবেন। তাদের মতে ধর্মপল্লীর সকল দায় দায়িত্ব ও কর্তৃত্ব হল যৌথ বিষয়। তাছাড়া তারা ধর্মপল্লীকে মনে করে একটি নির্দিষ্ট ভূমি বা এলাকার বিষয় মাত্র, প্রতিবেশি অন্য কোন সমাজের সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক নেই।

বর্তমান নির্দেশনায় কিন্তু মাণ্ডলিক আইন অনুসরণ করে ধর্মপল্লীর স্থানীয় ও প্রতিবেশি অন্যান্য ধর্মপল্লী ও পালকীয় সমাজগুলির সঙ্গে বিশেষ নিবিড় সম্পর্ক গড়ে তোলা ও উন্নয়নের কথা বলা হয়েছে। এই লক্ষ্য পূরণের জন্য নির্দিষ্ট এলাকায় অবস্থিত ধর্মপল্লীগুলির দলীয় সহযোগিতার কথা বলা হয়েছে-তা হতে পারে পালকীয় একক (Pastoral Units) বা ভিকারিয়েট (Vicariate)। আমাদের রাজশাহী ধর্মপ্রদেশে যে তিনটি ভিকারিয়া রয়েছে তা এই নির্দেশনারই বাস্তবায়ন। এইসব পালকীয় এককের কাজ হল "স্থানীয় প্রতিবেশি ধর্মপল্লীগুলির মধ্যে সমন্বিত সহযোগিতা বৃদ্ধি করা" *(Apostolorum Successores, arts. 215b; 217)*। ধর্মপ্রদেশের কেন্দ্রের সঙ্গে স্থানীয় ধর্মপল্লীগুলির সংযোগকে সুদৃঢ় করাই এর উদ্দেশ্য। নতুন নির্দেশনায় বড়-বড় ধর্মপ্রদেশের জন্য এপিসকপাল ভিকার (Episcopal Vicar) এর কথা বলা হয়েছে- যিনি ধর্মপ্রদেশীয় বিশপের সঙ্গে যুক্ত থেকে ও তাঁর নির্দেশনায় পালকীয় কার্য সম্পাদন করে থাকেন। বাংলাদেশের ধর্মপ্রদেশগুলিতে এখনও এই নজির নেই, বা এর আপাতত: প্রয়োজনও নেই। ধর্মপ্রদেশকে বিভিন্ন পালকীয় এককে ভাগ করে ধর্মপল্লীগুলি ও ধর্মপ্রদেশের মধ্যে প্রশাসনিক ও পালকীয় সহযোগিতা বাড়ানো প্রয়োজন রয়েছে। এর আসল লক্ষ্য হল খ্রিস্টমণ্ডলীর সার্বিক কল্যাণ। তবে যা-ই করা হোক না কেন,

১৪ পৃষ্ঠায় দেখুন

প্রভু তোমাতেই আনন্দ

সিস্টার সীম্মি পালমা আরএনডিএম

প্রভু তুমিই ভালবাসা, তোমার মাঝেই সর্বসুখ। তুমি আমাদের চিরস্থায়ী আশা, নিরাপদ আশ্রয়স্থল। জীবনের প্রতি মুহূর্তে আমাদের প্রয়োজনে, অপ্রয়োজনে সর্বদা পাশে আছ। ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভে আনন্দ উৎসারিত হয়। ঈশ্বর উপলব্ধি এক দিনে, এক সপ্তাহে, এক মাসে বা ১ বছরেও হয় না। তাঁকে সাধনা করতে করতে এমনেতেই হয়ে যায়। যেমন করে একজন ছেলে একজন মেয়ের মধ্যে প্রেম হয়ে যায়। কাউকে ভাল লাগা, ভালবাসা কেন যে হয়ে যায় তার সঠিক উত্তর আমরা দিতে পারি না। একজন মানুষকে প্রথমে আমরা দেখি, চিনি, তার কাছাকাছি যাই, তার সঙ্গে পথ চলি, তাকে ভাল লাগে তার পরেই হয়ে যায় বন্ধুত্ব আর ভালবাসা। ঈশ্বরের সঙ্গেও আমাদের সুন্দর গভীর ভালবাসাপূর্ণ সম্পর্ক ধীরে-ধীরে হয়। তাঁর সুগভীর ভালবাসা অনুভব করতে হলে প্রতিদিন তাকে সময় দিতে হবে তাঁর কাছে এসে বসতে হবে। আমরা তো তাঁকে দেখতে পাই না। তিনি বিভিন্ন সময়ে, বিভিন্নভাবে, বিভিন্ন আকার/রূপ নিয়ে আমাদের সামনে এসে ধরা দেন। প্রভুকে চিনতে হলে মনকে পবিত্র, শুদ্ধ করতে হবে। জীবন তখনই পবিত্র আলোকিত হয়, যখন আমরা দয়া, ক্ষমা, ভালবাসা, অহিংসা, সুন্দর মনোভাব ও সুচিন্তা দ্বারা পরিচালিত হব।

ভাল ও মন্দের মাঝে আমাদের এই সুন্দর জীবনটা। কতনা সুখে আনন্দে কেটে যায় দিন। যখন আনন্দে থাকি, তখন মনে হয় সবই যেন খুবই ভাল হচ্ছে। কিন্তু দুঃখ নামের বন্ধুটি যখন আমাদের আনন্দের দুয়ারে এসে উঁকি দেয়, তখন মনে হয় সব কিছু এলোমেলো হয়ে যাচ্ছে। বাইবেল আমাদের শিক্ষা দেয়, হাসি আর কান্নার মাঝেই আমাদের জীবন। সব সময় মিষ্টি খেতে যেমন ভাল লাগে না, টকও দরকার হয় মিষ্টির স্বাদ বুঝার জন্য। তেমনি সুখের সঙ্গে-সঙ্গে দুঃখ না থাকলে জীবন একঘেয়েমী হয়ে যাবে। যিশুর কাছ থেকে সুখটাকে যেমন আমরা আগ্রহ নিয়ে বরণ করি, তাহলে দুঃখটা নয় কেন? যিশুর জীবনে দেখি সুখ, দুঃখ, হাসি, কান্না এমন কি মৃত্যু যন্ত্রণাও। যিশুর দিকে যদি আমরা ধাবিত হই, তাহলে সুখের সঙ্গে সঙ্গে দুঃখটাকেও আশীর্বাদ হিসেবে গ্রহণ করতে হবে। বেশিরভাগ সময়ই তা সহজ হবে না, তাই প্রতিনিয়ত তার সঙ্গে যুক্ত থাকতে হবে। তখনই আমরা পথ চলতে শিখব, হোঁচট খেলেও পড়ে যাব না, ভেঙ্গে গেলেও মাটিতে লুটিয়ে পড়ব না। মনে রাখতে হবে আমাদের জীবনে খারাপ সময় আসবে, নেতিবাচক পরিস্থিতির সম্মুখীন হব। কষ্টদায়ক সময়ে কঠিন মানুষগুলোই আমাদের কিছু শিক্ষা দেয়। একটু লক্ষ্য করে দেখি তো যারা আমাদের খুব কাছের ভালবাসার মানুষ তারা কি আঘাত দিয়ে আমাদের দুর্বলতা, খুটি-নাটি বিষয়গুলো ধরিয়ে দিতে পারে? আমি বলব, তারা বেশিরভাগ সময়ই পারে না।

ঈশ্বর আমাদের পরম পিতা। তিনি জানেন আমাদের কিসে ভাল ও মন্দ হবে। একটি গল্প বলি : ভগবান একসময় তাঁর মৃত্যুদূতকে বলল, তুমি পৃথিবীতে যাও, আর দেখ যাদের মৃত্যুর সময় হয়েছে তাদের আত্মা আমার কাছে নিয়ে এসো। তখন মৃত্যুদূত একে একে শিশু, যুবক, যুবতী, বৃদ্ধ-বৃদ্ধা এইভাবে অনেক মেরে তাদের আত্মা ভগবানের কাছে আনল। কিন্তু লিয়ন নামে ছোট একটি ছেলের মা-বাবাকে মৃত্যুদূত ছেড়ে দিল। তখন ভগবান মৃত্যুদূতকে বলল, তুমি কেন লিয়নের বাবা-মার আত্মা আমার কাছে আনলে না। মৃত্যুদূত অনেক কষ্টে, রাগে ভগবানকে বলল, আপনি কি এই ছোট ছেলেটিকে দেখতে পাচ্ছেন না? মা-বাবার অনুপস্থিতিতে ছেলেটি একদম একা এতিম হয়ে যাবে। এমনকি ছোট ছেলেটি আর পৃথিবীতে বেঁচেও থাকতে পাবে না। কিন্তু ভগবান মৃত্যুদূতের কোন কথাই শুনলেন না। আর তাকে আদেশ দিলেন লিয়নের মা-বাবাকে মেরে ফেলতে। মা-বাবার মৃত্যুতে লিয়ন একেবারেই এতিম অসহায় হয়ে গেল। শুধু পথে-ঘাটে বসে-বসে কান্না করত। তারপর প্রায় ৩০/৪০ বছর পর ভগবান আবার মৃত্যুদূতকে আদেশ করলেন পৃথিবীতে গিয়ে লিয়ন নামের একটি ছেলের মা-বাবাকে নিয়ে আসতে। মৃত্যুদূত বলল এটা কি করে সম্ভব? তারা তো অনেক আগেই মারা গিয়েছেন। ভগবান তখন ধমক দিয়ে দূতকে পৃথিবীতে পাঠালেন। দূতটি পৃথিবীতে গিয়ে দেখে সেই ছোট ছেলেটি আজ কত বড় হয়েছে। নিজের দেশ ছেড়ে ইউরোপের একটি ধনী পরিবারের একমাত্র সন্তান হিসেবে পরিচিত এবং সে এখন উচ্চশিক্ষা নিয়ে ডাক্তার হয়ে মানুষের সেবা করছে। মৃত্যুদূত তখন তার ভুলটা বুঝতে পারল,আর ভাবল ভগবান কেন তাকে ধমক দিয়েছিল। লিয়নের মা-বাবার মৃত্যুর পর যখন সে রাস্তায় বসে থাকত, তখন আমেরিকা থেকে একজন দম্পত্তি বাংলাদেশে এসেছিল কোন একটি সন্তান দত্তক নেওয়ার জন্য। রাস্তায় বসে থাকা ছোট লিয়নকে দেখেই তাকে কোলে নিল আর প্রতিবেশিদের কাছ থেকে তার পরিবারের গভীর শোকের বর্ণনা জানল। সন্তানহারা এই দম্পত্তি লিয়নকে পেয়ে আনন্দে যেন আত্মহারা। নিজ দেশে নিয়ে সন্তানের স্নেহ, ভালবাসা দিয়ে লালন-পালন করেছেন।

আমরা যখন ঈশ্বরের কাছে আসি, তখন তিনি আমাদের বিভিন্ন পরীক্ষা দিয়ে তাঁর কাজের জন্য খাঁটি করে নেবেন। পরিবারে অর্থ সঙ্কট দিবেন, সম্পর্কের মাঝে দ্বন্দ্ব সৃষ্টি করবেন, সন্তানদের উশৃঙ্খল জীবনে পতিত করবেন, রোগ-শোক দিবেন, এই এতসব সমস্যা আর কঠিন বাস্তবতার মাঝেও কি করে ঈশ্বরের ওপর গভীর আস্থা স্থাপন করতে পারি, তারই পরীক্ষা তিনি নিয়ে থাকেন। আমরা যারা দৃঢ়ভাবে বিশ্বাসের ভিত গড়ে তুলেছি, তারা কখনও নড়ে যাব না, কিন্তু যারা সেই বাইবেলের বাণীর ন্যায় বালির ওপর দাঁড়িয়ে আছি, তারা অল্প দুঃখ-শোকে ভেঙ্গে পড়ব। আর নিজের অবহেলা, দুর্বলতার জন্য অন্যদের আর ঈশ্বরকে দোষারোপ করব।

বর্তমান পরিস্থিতি এই করোনাভাইরাস বিশ্বকে কাঁপিয়ে দিলেও, আমাদের অনেক শিক্ষা দিয়ে যাচ্ছে। আমরা মানব জাতি কেমন যেন নিজের অহংকার, গরিমা, ধন-সম্পদ, ক্ষমতা, মিথ্যাশিক্ষা, প্রতিপত্তি, লোভ, লালসায় মত্ত হয়ে যাচ্ছিলাম। সেবার ধর্ম উঠে গিয়ে নিজের স্বার্থের জয় কীর্তন হচ্ছিল। কে কার আগে যেতে পারে, কে কাকে অপমান, আঘাত, প্রতিশোধ নিতে পারে, আনাচে-কানাচে যেন শুধু প্রতিযোগিতার আনন্দ। আমরা বিভিন্ন পাপে এমনইভাবে তলিয়ে যাচ্ছিলাম যেন বুঝতেই পারছিলাম না। আমাদের এতসব পাপের বোঝা সৃষ্টিকর্তা আর মনে হয় নিতে পারছিল না। ঈশ্বরের সুন্দর সৃষ্টি ধ্বংস হতে যাচ্ছিল, কিন্তু পিতা পরমেশ্বর আমাদের থামিয়েছেন। আমাদের আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন একমাত্র তিনিই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী। আমরা তাঁর খেলার পুতুল মাত্র। তিনি চাইলে এক নিমিষেই আমরা ধুলিসাৎ হয়ে যাব। তাহলে আমাদের মাঝে এত রোষারেষি, কোলাহল, দ্বন্দ্ব কেন? কিসের আশায় আমরা মিথ্যা মরিচিকার পিছনে ছুটে মরছি। এতসব জ্ঞান, শিক্ষা, অর্থ, বাড়ি- গাড়ি, সম্মান, ধন-দৌলত কিছুই আমাদের জীবন রক্ষা করতে পারছে না। ২০২০ সালের এ মহামারিতে আমরা আমাদের কত কত প্রিয়জন, জ্ঞানী, গুণী, বিত্তবানদের হারিয়েছি। আমরা কেউ পারব না তাদের আবার ফিরিয়ে আনতে। শুধুই তাদের আত্মার চিরশান্তি কামনা করি।

প্রভু, তোমাতেই আমাদের আনন্দ। তোমার অপরিসীম ভালবাসা বোঝার জ্ঞান, বুদ্ধি দান কর। তোমার শক্তি ছাড়া আমরা পাপী মানুষ আজ বড়ই অসহায়। আমাদের সকল অন্যায়, অপরাধ ক্ষমা করে মুক্তি দাও এই মহামারীর হাত থেকে। আমাদের সত্য, সুন্দর, ন্যায়, ভালবাসার পথে চালিত কর॥

ঈশ্বর পরিকল্পনায়-মারীয়া

সৌমিক মোল্লা

মা-মারীয়া জগতের কাছে প্রকৃত আলো দান করেছেন। তিনি কুমারী ও যুবতী হওয়া সত্ত্বেও ঈশ্বরের ইচ্ছাকে নিজের মাঝে বাস্তব রূপ দিয়েছেন। তিনি ঈশ্বরের মহান ইচ্ছায় "হ্যাঁ" বলেছেন। তিনি ঈশ্বরের ইচ্ছাকে বাস্তব রূপ দেওয়ার জন্য নিজেকে দাসীর ন্যায় নমিত করেছেন। তিনি বলেছেন "আমি প্রভুর দাসী! আপনি যা বলেছেন, আমার তাই হোক!"(*লুক ১:৩৮ পদ*)। তিনি পিতা ঈশ্বরের পরিকল্পনাকে গ্রহণ করে মানব পরিত্রাণের পথ খুলে দিয়েছেন।

মা, যিনি জীবন দান করেন এবং একই সময়ে যিনি জীবন-যাপন করতে সাহায্য করেন। মারীয়া হলেন মা, যিশুর মা-তিনি যিশুকে দিয়েছেন নিজের রক্ত ও নিজের দেহ। তিনি নিজে পিতার অনন্ত বাণী আমাদের কাছে উপস্থাপন করেছেন। তিনি বিশ্বাস দিয়ে যিশুকে গ্রহণ করেছেন এবং ভালোবাসা দিয়ে তাকে জগতের কাছে দান করেছেন, যাতে তার মাধ্যমে জগৎ পরিত্রাণ লাভ করে।

মারীয়ার গীতিকায় তাঁর সমস্ত আত্মা ও ব্যক্তিত্ব প্রতিফলিত হয়। "আমার অন্তর গেয়ে ওঠে প্রভুর জয়গান" অর্থাৎ তিনি ঘোষণা করেন যে, ঈশ্বর মহান। মারীয়া হলেন আমাদের প্রতি প্রদত্ত ঈশ্বরের ভালবাসা, কোমলতা ও দয়ার ফল। তিনি সবকিছুতে ঈশ্বরের ইচ্ছাকে প্রথমে প্রাধান্য দিয়েছেন।

মারীয়ার প্রথম 'হ্যাঁ' থেকে শুরু করে, তাঁর অপ্রকাশ্য জীবনের দীর্ঘ সাধারণ বছরগুলির মধ্যদিয়ে তিনি যিশুকে গঠন করেছেন। তিনি পিতা ঈশ্বরের সকল ইচ্ছাকে নম্রভাবে মেনে নিয়েছেন। এমনকি ক্রুশের নিচে দাঁড়িয়ে পুত্র ঈশ্বরের "মা, ঐ দেখ, তোমার ছেলে!" (*যোহন ১৯:২৬ পদ*) এই বাণীকে তিনি অন্তরে গ্রহণ করেছেন । তিনি শিষ্য যোহন তথা সমগ্র মানবজাতিকে নিজের সন্তানরূপে গ্রহণ করেছেন।

মা-মারীয়াকে আমাদের জীবনের তারা হিসেবে গ্রহণ করা উচিত। মারীয়ার মাধ্যমে আমরা নম্রতা, বাধ্যতা, বিশ্বাস, আশা, ভালবাসা এবং বিভিন্ন সৎ গুণের চর্চা করতে পারি। মারীয়া ঈশ্বরের ইচ্ছাকে বিশ্বাস করেছেন। তিনি একজন বিশ্বাসী, যিনি বিশ্বাস ও ঈশ্বরের চিন্তা দিয়ে চিন্তা করেন এবং ঈশ্বররের ইচ্ছা অনুসারে সবকিছু কামনা করেন। স্বর্গীয় মা-মারীয়ার নিকট আমাদের প্রার্থনা করা উচিত যেন আমারও তার মতো ঈশ্বরের ইচ্ছাসকল আমাদের জীবনে মেনে নিতে পারি এবং সেই মতো জীবন-যাপন করতে পারি।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

** কুমারী মারীয়ার জীবনের আলোকে।*

স্নেহের কিশোরী-যুবতী বোনেরা,

মানব প্রেমী প্রভু যিশু তাঁর ভালবাসার দৃষ্টি নিয়ে দিকে তাকিয়ে আছেন পৃথিবীর দিকে এবং মানব সমাজে তাঁর কল্যাণ কাজ চালিয়ে যেতে ও জীবন চলার পথে তাঁর সাথী হবার জন্য তোমাদের নিমন্ত্রণ করছেন। তোমাদের সাথে তিনি কথা বলতে চান। তাঁর এই প্রেমালাপে অংশ নিতে, তাঁর বিশেষ ভালবাসার অভিজ্ঞতা করতে, ঐশ প্রেমের আহ্বানে সাড়া দিতে তোমরা যারা চিন্তা-ভাবনা করছ, এবং এ বছর এসএসসি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছ কিংবা অনার্স, ডিগ্রি, নার্সিং ট্রেনিং এ অধ্যয়নরত আছো এবং যারা ব্রতীয় জীবনে ও আমাদের সম্প্রদায়ে যোগ দিতে আগ্রহী তোমাদেরকে আমাদের সাথে অতিসত্বর যোগাযোগ করার জন্যে অনুরোধ জানাচ্ছি।

যোগাযোগের ঠিকানা

সিস্টার পলিন রোজারিও এসসি
কাপিতানিও কনভেন্ট, ৯৮/৯৯ আসাদ এভিনিউ
মোহম্মদপুর, ঢাকা ১২০৭
মোবাইল: ০১৭০৬১০৩৯৬৫

বিজ্ঞ/১৮৮/২০

হতভাগা

সংগ্রামী মানব

জীবন এক অবিরাম যাত্রা। জীবনের শুরু যেমন সমাপ্তিও তেমন। সৃষ্টির ইতিহাস অনুযায়ী মানব সর্বশ্রেষ্ঠ জীব। মানবের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ভেদাভেদ, বিভিন্ন জাত, গোত্র ও ধর্ম। কেউবা ব্রাহ্মণ, কেউবা দলিত, কেউবা হিন্দু, কেউবা মুসলিম, কেউবা খ্রিস্টান, কেউবা বৌদ্ধ, কেউবা ধর্মবিশ্বাসী আবার কেউবা অবিশ্বাসী। সে যাই হোক, সবার একই পরিচয় "মানব"। সৃষ্টিকর্তার বিশেষ সৃষ্টি। মাববের মধ্যে এক হতভাগা যার নাম অভিক। জন্ম ছায়াপত্র নামের একটি বাজারে। জন্মদানের পরই অভিকের মা মারা যায়। অভিকের বাবা কে তা কেউ জানে না। জন্মের পরেই তাকে একটি এতিমখানায় দিয়ে দেওয়া হয় এবং সেখানেই সে বড় হতে থাকে। তার বয়স যখন ছয় বছর তখন তাকে এতিমখানা থেকে বের করে দেওয়া হয়। তখন তার বাসস্থান হয়ে দাঁড়ায় পথ-ঘাট। পেশায় সে একজন টোকাই। ছোট বয়স থেকেই সে এই কাজের সাথে যুক্ত। যখন সে ছোট ছিল তখন তার দৈনিক আয় ছিল ৪০ টাকা আর এখন তা বেড়ে হয়েছে ১০০ টাকা। প্রতিদিন কাজে না গেলে তাকে অন্নহীন থাকতে হয়। মাসের বেশিরভাগ সময়ই সে অসুস্থ থাকে। যেদিন সে অসুস্থ সেদিন তার ভাগ্যে খাওয়া পানি কিছুই জুটে না। কোন একটা সময় রনির এলাকায় দেখা দিল এক প্রবল মহামারী। উর্ধ্বতন কর্মকর্তাগণ সবাইকে সচেতন হতে বলল ও মাস্ক পরতে বাধ্য করল। তারা সবাইকে মাস্ক কিনতে চাপও দিল। এমতাবস্থায় অভিক একদিন মাস্ক কেনার জন্যে দোকানে গেল। সে দোকানদারকে জিজ্ঞেস করল, ভাই সর্বনিম্ন দামের মাস্ক কত টাকা? দোকানদার বলল, একশত পঞ্চাশ টাকা। অভিক বলল, কমে দেওয়া যাবে? দোকানদার বলল, এক টাকা কম হলেও দেওয়া যাবে না, বর্তমানে মাস্কের অনেক চাহিদা। অভিকের হাতে আছে মাত্র ১০০ টাকা। এই টাকায় সে মাস্ক কিনতে পারল না। তাই অভিক মাস্ক না কিনে চলে গেল। সে ঠিক করল কয়েকদিন কাজ করে টাকা একত্রিত করে সে মাস্ক কিনবে। পরের দিন খুব সকালে সে কাজের উদ্দেশে বের হল। বেলা বারোটা নাগাদ পুলিশ তাকে ধরে ফেলল ও বেধরক মারপিট করল। পুলিশ বলল, তোর্ মাস্ক কোথায়?। অভিক বলল, স্যার আমি মাস্ক কিনতে গিয়েছিলাম তবে মাস্কের দাম একশত পঞ্চাশ টাকা বলে আর কিনিনি। যদি মাস্ক কিনি তবে তো আমি খেতে পাবো না। আর আমার কাছে মাস্ক কেনার জন্যে একশত পঞ্চাশ টাকা ছিল না। তারপর পুলিশ বলল, তবে বের হয়েছিস কেন? অভিক বলল, স্যার ভাঙ্গারি না টোকালে আমায় যে না খেয়ে মরতে হবে। পুলিশ পরবর্তীতে আরও মারপিট করে তাকে জিপ গাড়ীতে তুলল, তার দুহাতে হাতকঁড়া পরাল ও কারাগারে বন্দি করল। মাস্ক না পরায় তার তিন মাসের সাঁজা হল। সে দিনির পর দিন জেল হাজতে কাঁদতে লাগল। অতিশয় কষ্ট সহ্য করতে না পেরে সে একদিন কারাগারে আত্মহত্যা করল।

প্রিয় বন্ধুরা, উদারতা হল একটি মহৎ গুণ। আমার একটু উদারতা অন্যের মুখে হাঁসি ফুটাতে পারে। তাই এসো অভাগা ও গরীবদের সেবায় নিজেকে রিক্ত করি॥

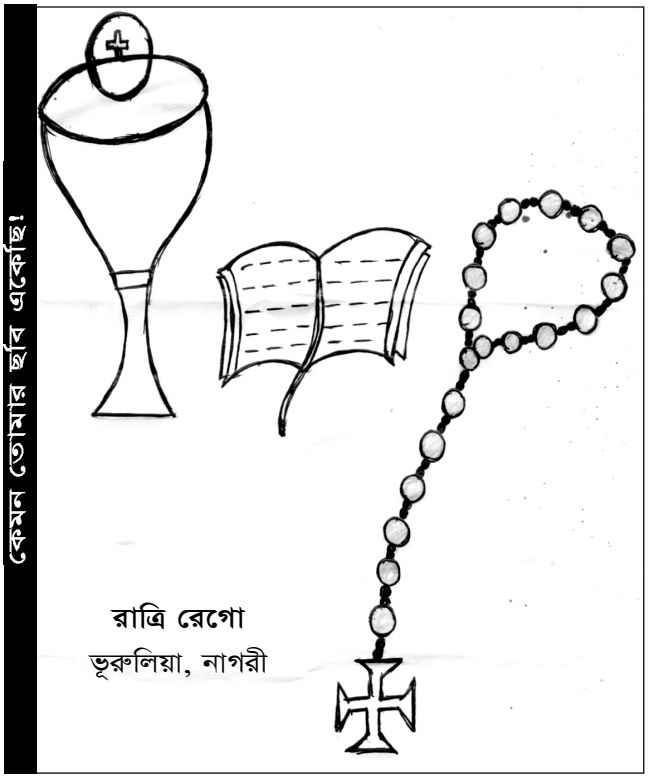

রাত্রি রেগো
ভূরুলিয়া, নাগরী

'লাউদাতো সি'র মূলকথা : সৃষ্টি-প্রকৃতির মঙ্গলবার্তা

ফাদার জ্যোতি এফ কস্তা

ধর্মবাণী বিশ্বমাঝে আছে যত মানুষ, আছে একজন সৃষ্টিকর্তা
মানুষের জন্য 'লাউদাতো সি'র মূলকথা, সৃষ্টির মঙ্গলবার্তা।
মানুষ আছে, যারা দর্শন, রাজনীতি আলোচনায় সমালোচনায়
একজন সৃষ্টিকর্তার ধারণাকে করে প্রত্যাখ্যান, অযৌক্তিকতায়।
বাস্তবতা হৃদয়ঙ্গমে স্বাতন্ত্র্যসূচক পদ্ধতির ব্যবহার বিজ্ঞান ও ধর্মে
সৃষ্টিকর্তার প্রতি মানুষের ধারণা-বিশ্বাস জন্মাবে জীবনকর্মে, মর্মে-মর্মে।
পবিত্র বাইবেল ও ধর্মবিশ্বাসের আলোকে ঈশ্বর মানব-মানবী করেন সৃষ্টি
শাস্ত্রীয় রচনায় প্রজ্ঞা, ভালবাসায় সৃষ্টি-সকল উত্তম, প্রয়োজন অন্তর্দৃষ্টি।
মানুষের ঈশ্বরের স্থানে নিজেকে বসানোর দাম্ভিকতা ও সীমাবদ্ধতায় ভগ্নতা
আদম-হবা হতে বড়, সবই হারালো, ঈশ্বরকে ছাড়া কেবল নগ্নতা।
ঈশ্বরের সুন্দর-সৃষ্টিকে ভালবেসে যত্ন না ক'রে 'কর্তৃত্ব করার ক্ষমতায়' তা নষ্ট
মানুষ ও সৃষ্টি-প্রকৃতির সৌহার্দপূর্ণ আদিমসম্পর্ক সংঘাতময়, হচ্ছে প্রকৃতির কষ্ট।
বাহ্যিকভাবে দৃশ্যমান কত মানুষের লোভ-স্বার্থপরতায় অপরিমেয় নানাবিধ দূষণ
যুদ্ধ-সহিংসতা, হিংসাত্মক কার্যকলাপ, চরম দুর্দশা-নির্যাতন, প্রকৃতির বড় ক্ষতিসাধন।
বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের নিগূঢ় রহস্য, ইহুদি-খ্রিস্টান ঐতিহ্য অনুসারে 'প্রকৃতি' অপেক্ষা ব্যাপক 'সৃষ্টি'
সৃজনকারের ভালবাসায় সৃজিত আকাশ-বাতাস, গ্রহ-নক্ষত্র সব-কিছু, অসীম তাঁর শক্তি।
প্রত্যেকজন মানুষই ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতে গড়া, সব-সৃষ্টির রয়েছে উদ্দেশ্য, করো উপলব্ধি
ধ্বংস নয় কখনো, জল-মাটি-বায়ু-অগ্নি-আকাশ সৃষ্ট সব-কিছুর উপাদান, করো নিয়ত শুদ্ধি।
ধনী-দরিদ্র, সাদা বা কালো সবারই সমান মর্যাদা, সবাইকে সৃষ্টি করেন মহান সৃষ্টিকর্তা ভগবান
সৃষ্টিকর্তা অধিশ্বর যিনি, তাঁর চোখে সবাই সমান, আলো-বাতাস, রোদ-বৃষ্টি সব-কিছুই তাঁর দান।

২৮তম জাতীয় খ্রিস্টান লেখক (ভার্চুয়াল) কর্মশালা ২০২০ খ্রিস্টাব্দ

এপিসকপাল যুব কমিশন ▮ এপিসকপাল যুব কমিশনের আয়োজনে গত ৫-৭ অক্টোবর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ, ভার্চুয়ালি '২৮তম জাতীয় খ্রিস্টান লেখক কর্মশালা ২০২০' অনুষ্ঠিত হয়। তিন দিনব্যাপী এই লেখক কর্মশালায় কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ের মোট ৫০ জন শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন।

৫ অক্টোবর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ বিকেল ৪টায় প্রার্থনার মধ্যদিয়ে '২৮তম জাতীয় খ্রিস্টান লেখক কর্মশালা শুরু হয়। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে 'কোর্স পরিচিতি, নিয়মাবলী, প্রাক-প্রশিক্ষণ ধারণা ও প্রত্যাশা' বিষয়ে সহভাগিতা করেন ব্রাদার উজ্জ্বল প্লাসিড পেরেরা সিএসসি, নির্বাহী সচিব ও জাতীয় যুব সমন্বয়কারী, এপিসকপাল যুব কমিশন। তিনি বলেন, ২৮ বছর ধরে এপিসকপাল যুব কমিশনের মধ্যদিয়ে এই কর্মশালা চলে আসছে। এতে প্রতীয়মান হয় যে, এই প্রোগ্রামটি কত টেকসই এবং ইতোমধ্যে এর মধ্যদিয়ে কতশত শিক্ষার্থী প্রশিক্ষণ পেয়েছে।

লেখক কর্মশালার প্রথম দিনে "বাংলা সাহিত্যের ক্রমবিকাশ ও ধারা এবং বাংলা উচ্চারণ" এ বিষয়ে উপস্থাপনা করেন উন্মেষ ধর, প্রভাষক, বাংলা বিভাগ, সেন্ট যোসেফ কলেজ, ঢাকা।

দ্বিতীয় দিনে "খবর, রিপোর্ট, স্পট রিপোর্ট ও ফিচার লেখার কৌশল" এ বিষয়ে উপস্থাপনা করেন উইলিয়াম নকরেক, সমন্বয়কারী, এশিয়া প্যাসিফিক আইএমসিএস। তিনি তার সহভাগিতায় কোনটা খবর আর কীভাবে স্পট রিপোর্ট ও ফিচার লিখতে হবে এই বিষয়ে কিছু নমুনা তুলে ধরেন।

তৃতীয় দিনে "খ্রিস্টীয় অনুবাদ সাহিত্যঃ বাইবেলীয় পুস্তক লেখার ধরণ ও উদ্দেশ্য" এর ওপর উপস্থাপনা করেন ফাদার প্যাট্রিক শিমন গমেজ, পরিচালক, পবিত্র আত্মা উচ্চ সেমিনারী, ঢাকা। তিনি পবিত্র বাইবেলের বাংলা অনুবাদ ও বাইবেল কিভাবে লেখা হয়েছিল এবং বাংলার প্রথম মুদ্রিত বাংলাগ্রন্থ 'কৃপা-শাস্ত্রের অর্থভেদ' সম্পর্কে সহভাগিতা করেন। উক্ত কর্মশালার শেষ অধিবেশনে "খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের কার্যক্রম, কর্ম পরিধি ও দায়বদ্ধতা" বিশেষ করে খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্রের বিভিন্ন সেক্টর যথা: সাপ্তাহিক প্রতিবেশী, জেরি প্রিন্টিং প্রেস, প্রতিবেশী প্রকাশনী, জ্যোতি কমিউনিকেশন বাণীদীপ্তি ও রেডিও ভেরিতাস এশিয়া এর ওপর উপস্থাপনা করেন ফাদার বুলবুল আগস্টিন রিবেরু, পরিচালক, খ্রীষ্টীয় যোগাযোগ কেন্দ্র, ঢাকা। কীভাবে এই প্রতিষ্ঠানটি কাজ করছে ও দেশ-বিদেশে অবদান রাখছে সেই বিষয়গুলো তুলে ধরেন। তিনি আরো বলেন, সাপ্তাহিক প্রতিবেশী দেশের অন্যতম পুরাতন ও একমাত্র জাতীয় কাথলিক পত্রিকা যার মধ্যদিয়ে খ্রিস্টীয় বিশ্বাস ও মূল্যবোধ তুলে ধরা হয়। অতপর, অংশগ্রহণকারীদের মধ্য থেকে দুজন এই কর্মশালায় অংশগ্রহণের অভিজ্ঞতা ও তাদের অনুভূতি সহভাগিতা করে। সেসাথে, এপিসকপাল যুব কমিশন কর্তৃক আয়োজিত 'সাহিত্য প্রতিযোগিতা ২০২০' এর ফলাফল ঘোষণা করা হয়।

সমাপনী অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বিশপ সুব্রত লরেন্স হাওলাদার সিএসসি, সভাপতি, এপিসকপাল যুব কমিশন। তিনি সবাইকে ধন্যবাদ জানিয়ে অংশগ্রহণকারীদের উদ্দেশে বলেন, লেখক হতে হলে লেখার অভ্যাস গড়ে তুলতে হবে। ঈশ্বর যে অনুগ্রহ দিয়েছেন সেই অনুগ্রহ বা দান আমরা যেন অন্যদের সাথে সহভাগিতা করি। এছাড়া তিনি 'একজন লেখকের কি কি গুণাবলী, আদর্শ ও মূল্যবোধ থাকা আবশ্যক' সে ব্যাপারে অনুপ্রেরণামূলক কথা বলেন। এর পর সিস্টার রোজলিন সন্ধ্যা রোজারিও আরএনডিএম, অফিস সমন্বয়কারী, এপিসকপাল যুব কমিশন, সবার উদ্দেশে ধন্যবাদমূলক বক্তব্য রাখেন। সর্বশক্তিমান ঈশ্বরকে ধন্যবাদ জানিয়ে বিশপ লরেন্স সুব্রত হাওলাদার সিএসসি'র শেষ আশীর্বাদের মধ্যদিয়ে '২৮তম জাতীয় খ্রিস্টান লেখক কর্মশালা ২০২০' এর সমাপ্তি ঘোষণা করেন॥

অবসরপ্রাপ্ত ঢাকার আর্চবিশপ কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি'রোজারিও সিএসসি'র নতুন বাসস্থান সিবিসিবি সেন্টার

ব্রাদার উজ্জ্বল প্লাসিড পেরেরা সিএসসি ▮ কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি' রোজারিও সিএসসি, ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের আর্চবিশপ ও একইসাথে বাংলাদেশ কাথলিক বিশপ সম্মিলনী'র প্রেসিডেন্ট-এর দায়িত্ব থেকে অবসর গ্রহণের পর গত ১৫ অক্টোবর ২০২০ খ্রিস্টাব্দে সকালে রমনা আর্চবিশপ ভবন থেকে নতুন আবাসস্থল বাংলাদেশ

কাথলিক বিশপ সম্মিলনী কেন্দ্র অর্থাৎ সিবিসিবি সেন্টারে চলে আসেন। ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের সহকারি বিশপ শরৎ ফ্রান্সিস গমেজ, কয়েকজন ফাদার ও সিস্টার এবং সিবিসিবি সেন্টারের বর্তমান পরিচালক ফাদার জ্যোতি ফ্রান্সিস কস্তা'সহ বিভিন্ন এপিসকপাল কমিশনের সদস্যগণ ও সেন্টারের কর্মীবৃন্দ তাকে নতুন আবাসস্থলে বরণ করে নেন। সেন্টারের পরিচালক ফাদার জ্যোতি এফ কস্তা কার্ডিনালকে শুভেচ্ছা জানানোর সাথে-সাথে সকল প্রকার সাহায্য-সহযোগিতা দানের প্রত্যাশা ব্যক্ত করেন।

কার্ডিনাল প্যাট্রিক ডি' রোজারিও সিএসসি বলেন, 'ঈশ্বরের পরিকল্পনা অনুযায়ী গুরুদায়িত্ব পেয়ে বিভিন্ন জায়গায় ভক্তজনগণের সেবা করার সুযোগ পেয়েছি। নতুন-নতুন দায়িত্ব নিয়ে বিভিন্ন জায়গায় গিয়েছি এবং মানুষও সাদরে বরণ করেছেন। ঢাকা মহাধর্মপ্রদেশের মহাধর্মপালের দায়িত্ব থেকে অবসর নেয়ার পর স্বেচ্ছায় আনন্দিত মনে আমি এই সিবিসিবি সেন্টারে এসেছি। ঈশ্বর আমার জন্য কি পরিকল্পনা করে রেখেছেন তা এখানে থেকে অনুধাবন করবো, একই সাথে এখানে থেকে কিছু পড়াশোনা, লেখালেখি ও গবেষণার কাজ চালিয়ে যাবো।' এছাড়াও, এই সেন্টারে তাকে আন্তরিকভাবে বরণ করে নেয়ার জন্য ও সমস্ত আয়োজনের জন্য সবাইকে ধন্যবাদ জানান।' পরিশেষে, কার্ডিনালের অবসর জীবন আনন্দময় হোক তার জন্য প্রার্থনা এবং আমরা তার সুস্বাস্থ্য, দীর্ঘায়ু ও সার্বিক মঙ্গল কামনা করেন॥

জাফলং ধর্মপল্লীতে সাধু ভিনসেন্ট ডি'পলের পর্ব উদ্‌যাপন

ওয়েলকাম লামিন ▮ ৩ অক্টোবর, জাফলং ধর্মপল্লীর সাধু প্যাট্রিকের গির্জায় সাধু ভিনসেন্ট ডি' পলের পর্ব উদ্‌যাপন করা হয়। সকাল ১০টায় খ্রিস্টযাগের মধ্যদিয়ে অনুষ্ঠান শুরু হয়। খ্রিস্টযাগ উৎসর্গ করেন জাফলং ধর্মপল্লীর পাল-পুরোহিত ফাদার রনাল্ড গাব্রিয়েল কস্তা। তিনি তার উপদেশবাণীতে বাইবেলের আলোকে সাধু ভিনসেন্ট এর জীবনী সহভাগিতা করেন। তিনি বলেন- সাধু ভিনসেন্ট দীন-দরিদ্রদের ভালবেসেছেন, সেবা করেছেন। দরিদ্রদের মাঝে তিনি খ্রিস্টকে খুঁজে পেয়েছেন। খ্রিস্টযাগের পর ছিল বিশেষ সহভাগিতা। যোশুয়া খংস্লিং খাসিয়া নৃগোষ্ঠীর মানুষেরা তাদের স্ব-স্থানে থেকে কিভাবে সেবা করতে পারেন, সেই বিষয়ে সহভাগিতা করেন। তিনি বলেন, অনেক সময় আমাদের সামর্থ থাকা সত্ত্বেও সহযোগিতা করতে এগিয়ে যাই না। আমাদের মধ্যে অলসতা কাজ করে। খ্রিস্টের জন্য কাজ করতে হলে এই অলসতা বাদ দিতে হবে। ওয়েলকাম লম্বা যিশুর সেবাকাজের আঙ্গিকে আমরা কিভাবে সেবাকাজ করছি এবং ভবিষ্যতে করতে পারি সেই বিষয়ে সহভাগিতা করেন। তিনি বলেন, সেবাকাজের জন্য আমাদের সুন্দর মন ও ইচ্ছাশক্তি দরকার। এগুলো থাকলে আমরা সুন্দর সেবাকাজ করতে পারব। এর মধ্যদিয়ে খ্রিস্ট প্রকাশিত হবেন। ফাদার রনাল্ড কস্তা তার সহভাগিতায় সেবাকাজে আরও বেশি মনোযোগী হতে উৎসাহিত করেন। সহভাগিতার পর দরিদ্রদের হাতে জাফলং ধর্মপল্লীর পাল পুরোহিত ক্ষুদ্র উপহার তুলে দেন এবং সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন। দুপুরে আহারের মধ্যদিয়ে ১:৩০ মিনিটে উক্ত অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে॥

আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-২০ মূল প্রতিপাদ্য : "দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে সুশাসন, নিশ্চিত করবে টেকসই উন্নয়ন"

সুকুমার এস কস্তা ▮ গত ১৩ অক্টোবর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ রোজ মঙ্গলবার, "দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাসে সুশাসন, নিশ্চিত করবে টেকসই উন্নয়ন" এই মূল প্রতিপাদ্য বিষয়কে কেন্দ্র করে, কারিতাস সিলেট অঞ্চলের সহযোগিতায় বানিয়াচং উপজেলার উক্ত ইউনিয়নে দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা কমিটির উদ্যোগে মুরাদপুর এসইএসডিপি মডেল মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের হল রুমে আন্তর্জাতিক দুর্যোগ প্রশমন দিবস-২০২০ খ্রিস্টাব্দ উদ্‌যাপন উপলক্ষে ওয়ার্ড পর্যায়ের সহায়ক দলের মাধ্যমে মহড়া ও আলোচনা সভা করা হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ১৪নং মুরাদপুর ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান মো: মোতাহার মিয়া তালুকদার, প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন উপজেলা চেয়ারম্যান মো: আবুল কাসেম চৌধুরী-বানিয়াচং উপজেলা এবং বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন প্রকল্প বাস্তবায়ন কর্মকর্তা মলয় কুমার দাস-বানিয়াং উপজেলা ও জুনিয়র কর্মসূচি কর্মকর্তা আবু তাহের-কারিতাস সিলেট অঞ্চল। অনুষ্ঠানের শুরুতে ছোট আকারে র‍্যালী করা হয়। এরপর ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ড হতে আগত সহায়ক দলের সদস্যদের মাধ্যমে পানিতে ডুবে যাওয়া ব্যক্তিকে উদ্ধারের কৌশল, আহত ব্যক্তিকে বহন করার বিভিন্ন কৌশল, বিভিন্ন প্রকার ব্যান্ডেজের ব্যবহার, ওয়াশ এর কৌশল, করোনাকালীন স্বাস্থ্যবিধি ও সামাজিক দুরত্ব মেনে চলার কৌশল, পানি বিশুদ্ধ করার কৌশল মহড়া আকারে প্রদর্শন করা হয়। আলোচনা সভায় উপজেলা চেয়ারম্যান মো: কাসেম চৌধুরী বলেন, এবারের বন্যায় যাদের বসত ভিটি নিচু ও দুর্বল ঘর-বাড়ি ছিল তাদের বন্যার পানিতে তলিয়ে গেছে ও ভেঙ্গে গেছে। এখন আমাদের বসতভিটা উঁচু ও ঘর-বাড়ি মজবুত করতে হবে। সকলকে করোনাকালীন স্বাস্থ্যবিধি ও সামাজিক দূরত্ব বজায় রেখে চলাচলের আহ্বান জানিয়ে উক্ত সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন তিনি॥

সাপ্তাহিক প্রতিবেশী
প্রতিবেশী'র বার্ষিক চাঁদা পরিশোধ করেছেন কি?

DHARENDA CHRISTIAN CO-OPERATIVE CREDIT UNION LTD.

ধরেন্ডা খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ

ফাদার লিউ জে. সালিভ্যান (সি.এস.সি) ভবন
ধরেন্ডা মিশন, ডাকঘরঃ সাভার, জেলাঃ ঢাকা
স্থাপিতঃ ১৯৬০ খ্রিস্টাব্দ, রেজি. নং- ৮/১০-১০-১৯৮৫ খ্রিস্টাব্দ ও ৪২/৩-১২-২০০৩ খ্রিস্টাব্দ
Phone: 7741926, Mob: 01911482807, E-mail: dcccu.ltd@gmail.com

সূত্র নং: ডিসিসিসিইউএলটিডি/প্রেসিডেন্ট-সেক্রেটারী/২০২০-২০২১/১১৭ তারিখ: ১৬/১০/২০২০ খ্রিস্টাব্দ

পুন নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

ধরেন্ডা খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ-এর জন্য নিম্নলিখিত পদে নিয়োগের জন্য যোগ্য প্রার্থীদের নিকট হতে দরখাস্ত আহ্বান করা যাচ্ছে:

ক্র নং	পদের নাম	পদ সংখ্যা	বয়স	লিঙ্গ	বেতন স্কেল	শিক্ষাগত যোগ্যতা ও অভিজ্ঞতা
১.	অফিসার (সফটওয়্যার অপারেশন)	১.	অনূর্ধ্ব ৪০ বছর	পুরুষ	আলোচনা সাপেক্ষে	▪ অনুমোদিত বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমবিএ/স্নাতকোত্তর (একাউন্টিং) ডিগ্রীধারী হতে হবে। CSE বিষয়ে ডিপ্লোমা অর্জনকারী প্রার্থীর অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হবে। কোন পরীক্ষায় ৩য় বিভাগ অথবা সিজিপিএ ২.০০ এর নীচে গ্রহণযোগ্য নয়। ▪ সংশ্লিষ্ট বিষয়ে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং ব্যাংক/বীমা/ক্রেডিট ইউনিয়ন/সমজাতীয় আর্থিক প্রতিষ্ঠানে একাউন্টিং সফটওয়্যার পরিচালনায় অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। ▪ নেটওয়ার্ক এডমিন এবং সার্ভার এডমিন হিসাবে দায়িত্ব পালনে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। ▪ সফটওয়্যার ও হার্ডওয়্যার সম্পর্কিত জ্ঞানসহ সফটওয়্যার এর প্রয়োজনীয়তা বিশ্লেষণ করে সময়ের চাহিদা অনুযায়ী সফটওয়্যারের মডিউলসমূহ ডেভেলপমেন্ট করার দক্ষতা থাকতে হবে। ▪ বিভিন্ন ডিপার্টমেন্টের কালেকশন ও পেমেন্ট সংক্রান্ত ডাটাসমূহ সফটওয়্যারে ইউজার অপারেশনাল আইডি হতে পোস্টিং দেয়ার পর প্রিন্টেট কপির সাথে ক্রস-চেকের মাধ্যমে পুনর্নিরীক্ষণপূর্বক নিশ্চিত করতে হবে। দিন শেষে ডাটা সার্ভার হতে ইন্টারনাল এবং এক্সটারনাল ডাটা ব্যাক-আপ নেয়ার দক্ষতা থাকতে হবে। ▪ আর্থিক প্রতিষ্ঠানের মাসিক ও বার্ষিক হিসাব বিবরণী প্রস্তুতকরণে জ্ঞান ও অভিজ্ঞতা থাকা প্রার্থীর অতিরিক্ত যোগ্যতা হিসেবে বিবেচিত হবে। ▪ ক্রেডিট ইউনিয়নের বিভিন্ন প্রোডাক্ট সম্পর্কে স্পষ্ট জ্ঞান থাকতে হবে। একাউন্টিং সফটওয়্যারে বিভিন্ন মডিউল অপারেট করা, জার্নাল, জেনারেল লেজার, পার্সোনাল লেজারসহ সংশ্লিষ্ট বিষয় সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে। ▪ রাউটার Mikrotik, Tp-Link, Access Control Device সম্বন্ধে জ্ঞান থাকতে হবে। ▪ বিভিন্ন ব্র্যান্ডের নেটওয়ার্ক/ ইউএসবি প্রিন্টার এর সমস্যার সমাধান এবং ইউজার সাপোর্ট এ দক্ষতা থাকতে হবে। ক্রেডিট ইউনিয়ন ব্যবস্থাপনা ও আইন সম্পর্কে জ্ঞান থাকতে হবে। ▪ কাজের প্রয়োজনে নির্ধারিত অফিস সময়সীমার অতিরিক্ত সময় কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে এবং ▪ সেবা কেন্দ্রসমূহে যাতায়াত করার মনোভাব থাকতে হবে। ▪ সংশ্লিষ্ট কাজে অভিজ্ঞতা সম্পন্ন প্রার্থীদের অগ্রাধিকার দেয়া হবে। ▪ বাংলা ও ইংরেজি টাইপিং-এ দক্ষতা থাকতে হবে।

শর্তাবলী

০১। সমিতির প্রেসিডেন্ট/সেক্রেটারি বরাবর পূর্ণ জীবন বৃত্তান্তসহ স্ব-হস্তে লিখিত আবেদন পত্র পাঠাতে হবে।
০২। আবেদনপত্রের সাথে অবশ্যই শিক্ষাগত যোগ্যতার সনদপত্র, অভিজ্ঞতার সনদপত্র, জাতীয় পরিচয়পত্র, চারিত্রিক সনদপত্রের অনুলিপি ও সদ্য তোলা ০২ কপি পাসপোর্ট সাইজের ছবি ১ম শ্রেণীর গেজেটেড কর্মকর্তা কর্তৃক সত্যায়িত করে জমা দিতে হবে।
০৩। ০২ (দুই) জন গণ্যমান্য ব্যক্তির নাম, ঠিকানা ও মোবাইল নম্বর রেফারেন্স হিসাবে দিতে হবে (যিনি আপনাকে ভালভাবে চেনেন)।
০৪। খামের উপর স্পষ্টাক্ষরে আবেদনকৃত পদের নাম উল্লেখ করতে হবে।
০৫। দেশে অবস্থানরত উক্ত বিষয়ে যোগ্যতাসম্পন্ন যে কোন খ্রিস্টান ব্যক্তি (ক্যাথলিক/নন-ক্যাথলিক) উভয়েই উক্ত পদের জন্য আবেদন করতে পারবেন।
০৬। তথ্য গোপন, মিথ্যা তথ্য প্রদান এবং ব্যক্তিগত যোগাযোগকারী বা কারোর মাধ্যমে সুপারিশকৃত প্রার্থীগণ অযোগ্য বলে বিবেচিত হবে।
০৭। নেশাজাতীয় দ্রব্য গ্রহণে অভ্যস্তদের আবেদন করার প্রয়োজন নেই।
০৮। অভিজ্ঞতাসম্পন্ন প্রার্থীর ক্ষেত্রে বয়স শিথিলযোগ্য।
০৯। আগ্রহী প্রার্থীকে অবশ্যই সৎ, কর্মঠ ও সেবামূলক কাজে উদ্যোগী হতে হবে এবং কর্ম এলাকায় অবস্থান করে কাজ করার মানসিকতা থাকতে হবে।
১০। চাকুরীরত প্রার্থীকে যথাযথ কর্তৃপক্ষের মাধ্যমে আবেদন করতে হবে।
১১। ত্রুটিপূর্ণ/অসম্পূর্ণ আবেদনপত্র কোন কারণ দর্শানো ব্যতিরেকে বাতিল বলে গণ্য হবে।
১২। প্রাথমিক বাছাইয়ের পর কেবলমাত্র যোগ্য প্রার্থীদের মোবাইল ফোনের মাধ্যমে লিখিত পরীক্ষায় অংশগ্রহণের জন্য জানানো হবে। লিখিত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ প্রার্থীদের মৌখিক পরীক্ষা ও কম্পিউটার টেস্টের জন্য বিবেচনা করা হবে। সাক্ষাৎকারের সময় প্রার্থীর মূল কাগজপত্র প্রদর্শন করতে হবে।
১৩। লিখিত ও মৌখিক পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করার জন্য কোন প্রকার টিএ/ডিএ প্রদান করা হবে না।
১৪। আবেদনপত্র আগামী ১২ নভেম্বর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ তারিখের মধ্যে সরাসরি/ডাকযোগে/কুরিয়ার সার্ভিসের মাধ্যমে নিম্ন ঠিকানায় পৌঁছাতে হবে।
১৫। এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি কোন কারণ দর্শানো ব্যতীত পরিবর্তন, স্থগিত বা বাতিল করার অধিকার কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করেন।
১৬। এই নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি সমিতির অফিসিয়াল ফেসবুক পেইজ এবং www.dcccul.com ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

		আবেদনপত্র পাঠানোর ঠিকানা
মাইকেল জন গমেজ প্রেসিডেন্ট ধরেন্ডা খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ	জুয়েল সিরিল কস্তা সেক্রেটারি ধরেন্ডা খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ	ম্যানেজার (প্রশাসন) ধরেন্ডা খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লিঃ ফাদার লিউ জে' সালিভ্যান (সিএসসি) ভবন ধরেন্ডা মিশন, সাভার, ঢাকা-১৩৪০।

বিপ/১৮৭/২০

নয়ানগর খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি.

স্থাপিত: ১৯৯২ খ্রীষ্টাব্দ, রেজি. নং-৭১/৯৮, ক-৪৭/১, নদ্দা, গুলশান, ঢাকা-১২১২

২৮তম বার্ষিক সাধারণ সভার বিজ্ঞপ্তি

(১ জুলাই ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ হতে ৩০ জুন ২০২০ খ্রিস্টাব্দ)

তারিখ: ২০ নভেম্বর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ, শুক্রবার, সময়: সকাল ১০টায়

স্থান: ডি' মাজেনড্ ক্যাথলিক গির্জা, নয়ানগর, বারিধারা, গুলশান, ঢাকা-১২১২

এতদ্বারা নয়ানগর খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি.-এর সম্মানিত সদস্য-সদস্যাদের সদয় জ্ঞাতার্থে জানানো যাচ্ছে যে, আগামী ২০ নভেম্বর ২০২০ খ্রিস্টাব্দ, রোজ: শুক্রবার, সকাল ১০টায়, "ডি' মাজেনড্ ক্যাথলিক গির্জা", নয়ানগর, বারিধারা, গুলশান, ঢাকা-১২১২ এর মিলনায়তনে করোনাকালীন সকল প্রকার স্বাস্থ্যবিধি মেনে অত্র সমিতির **২৮তম বার্ষিক সাধারণ সভা অনুষ্ঠিত হবে।** উক্ত বার্ষিক সাধারণ সভায় সদস্য-সদস্যাদের নিজ-নিজ পরিচয়পত্র অথবা ছবি যুক্ত ক্রেডিট পাশ বই এবং সাধারণ সভার প্রতিবেদনসহ যথাসময়ে উপস্থিত থেকে সভাকে সাফল্যমণ্ডিত করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করা যাচ্ছে।

উল্লেখ্য যে, **সকাল ৮টা হতে সভার রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম শুরু হবে।**

সাধারণ সভার কর্মসূচি

উদ্বোধনী:

(ক) উপস্থিতি গণনা, কোরাম পূর্তি ও আসন গ্রহণ, মিনিটস্ সেক্রেটারি নিয়োগ, জাতীয় ও সমবায় পতাকা উত্তোলন, পবিত্র বাইবেল থেকে পাঠ এবং প্রার্থনা;
(খ) প্রয়াত সদস্য-সদস্যাদের আত্মার কল্যাণার্থে প্রার্থনা ও নীরবতা পালন;
(গ) কৃতি শিক্ষার্থীদের সংবর্ধনা;
(ঘ) সভাপতির স্বাগত ভাষণ।

মূল কর্মসূচি:

০১। ২৭তম বার্ষিক সাধারণ সভার কার্যবিবরণী উপস্থাপন ও অনুমোদন;
০২। ব্যবস্থাপনা কমিটির কার্যক্রমের ওপর বাৎসরিক রিপোর্ট পর্যালোচনা ও অনুমোদন;
০৩। বার্ষিক হিসাব বিবরণী এবং উদ্বৃত্তপত্র বিবেচনা ও অনুমোদন;
০৪। নিরীক্ষা প্রতিবেদন পর্যালোচনা ও অনুমোদন;
০৫। পরবর্তী আর্থিক বৎসরের জন্য প্রাক্কলিত বাজেট পর্যালোচনা ও অনুমোদন;
০৬। নতুন প্রস্তাবনা পেশ ও অনুমোদন;
০৭। স্টাফ সার্ভিস রুলস অনুমোদন।

অন্যান্য কর্মসূচি:

(ক) ক্রেডিট কমিটির প্রতিবেদন পেশ ও অনুমোদন;
(খ) সুপারভাইজরী কমিটির প্রতিবেদন পেশ ও অনুমোদন;
(গ) খেলাপী ঋণ আদায় কমিটির প্রতিবেদন পেশ ও অনুমোদন;
(ঘ) বিবিধ;
(ঙ) লটারী ড্র;
(চ) ধন্যবাদ জ্ঞাপন ও সমাপনী প্রার্থনা।

মার্টিন এস. পেরেরা
সভাপতি
নয়ানগর খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি.

শুভজিৎ সাংমা
সম্পাদক
নয়ানগর খ্রীষ্টান কো-অপারেটিভ ক্রেডিট ইউনিয়ন লি.

বি:দ্র: (ক) সমবায় সমিতি আইন ২০০১ এর ধারা ৩৭ মোতাবেক কোন সদস্য/সদস্যা সমিতিতে শেয়ার ও ঋণ খেলাপী হলে তা পরিশোধ না করা পর্যন্ত উক্ত সদস্য/সদস্যা সাধারণ সভায় তার অধিকার প্রয়োগ করতে পারবে না;
(খ) সকাল ৮টা থেকে ১০টার মধ্যে যারা নাম রেজিস্ট্রেশন করবেন,তাদের নামই কেবল কোরাম পূর্তি বিশেষ লটারীতে অন্তর্ভূক্ত হবে। কোরাম পূর্তি লটারীতে আকর্ষণীয় পুরস্কার প্রদান করা হবে;
(গ) সম্মানিত সদস্য-সদস্যাদের সকাল ৮টা হতে ১০টার মধ্যে উপস্থিত হয়ে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করত: খাদ্য কুপন সংগ্রহ করে সাধারণ সভা সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সম্পাদন করতে অনুরোধ করছি;
(ঘ) বৈশ্বিক মহামারী করোনাভাইরাসের কারণে সামাজিক দূরত্ব বজায় রাখা ও মাস্ক পরিধান করার জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ করছি।

বিজ্ঞ/১৯৪/২০২০

বর্ষ ৮০ ❖ সংখ্যা- ৩৯
THE WEEKLY PRATIBESHI
Issue - 39
Regd. No. DA-33
❖ 25 - 31 October, 2020, ১০ - ১৬ কার্তিক, ১৪২৭ বঙ্গাব্দ

BOOK POST

প্রয়াত আলফন্স রোজারিও

জন্ম : ২৭ ডিসেম্বর, ১৯৪৫ খ্রিস্টাব্দ
রাঙ্গামাটিয়া মিশন, ছোট সাতানীপাড়া

মৃত্যু : ৬ অক্টোবর, ২০২০ খ্রিস্টাব্দ
কুচিলা বাড়ি, মঠবাড়ী মিশন
(রাত ৩:৫০ মিনিট)

ভালোবাসা সবকিছু বহন করে,
সবকিছু বিশ্বাস করে,
সবকিছু আশা করে,
সবকিছু সহ্য করে,
ভালবাসা কখনই শেষ হয় না।

মৃত্যুতে আলো নিভে না; এটি কেবল প্রদীপ জ্বালিয়ে দিচ্ছে কারণ ভোর হয়েছে। তেমনি তোমার মৃত্যুও আমাদের প্রদীপ করে জ্বালিয়ে রেখে গেছো তুমি দাদু। তুমি আমাদের সবার আদর্শ, কিন্তু হঠাৎ এমন করে চলে যাবে এটা কারো জানা ছিল না। জানা ছিল না যে, আর কথা হবে না, হাঁটা হবে না একসাথে, খাওয়া হবে না এক টেবিলে তোমার সাথে। তুমি তোমার প্রথম জীবনে দারিদ্র্যতা ভোগ করেছ, পরে ভোগ করেছ ঐশ্বর্য, কিন্তু কোনটাকেও তোমার জীবনকে প্রভাবিত করতে দাওনি। দারিদ্র্যতা থেকে বেড়িয়ে এসেছো, আমাদেরকে সাফল্যের পথ দেখিয়েছ। তোমার জীবন ছিলো নিয়ম-শৃঙ্খলায় ঘেরা, নিয়ম-শৃঙ্খলায় থেকে কিভাবে জীবনে সফলতা ও ভাল স্বাস্থ্য লাভ করা যায় তা তুমি আমাদের দেখিয়েছ। গ্রামে সবার জন্য ছিলে তুমি যোগ্য পরামর্শদাতা, আমাদের জন্য সব থেকে বেশি ভালবাসার মানুষ। তোমার হঠাৎ চলে যাওয়া সবার জন্য কষ্টকর হয়ে দাঁড়িয়েছে, কিন্তু তুমি রেখে গিয়েছ তোমার আদর্শ, তোমার প্রতিটি কথা আমাদের জন্য উপদেশের মত ছিল। দীর্ঘ বাইশ দিন তুমি হাসপাতালে আমাদের থেকে দূরে ছিলে, সেখান থেকেই চলে গেলে না ফেরার দেশে, এখনও মনে হয় যেন তুমি জীবিতই আছো, হাসপাতালেই আছো; যেন আমরা অপেক্ষায়ই আছি তুমি শীঘ্রই ফিরে আসবে। আমরা জানি যে তুমি এখনও আমাদের সাথেই আছ, আমাদের জন্য প্রার্থনা করছো, আমাদের কষ্ট দেখে কষ্ট পাচ্ছ আর বলছো যেমনটা তুমি সব সময় বলতে "যখন তুমি এসেছিলে ভবে, কেঁদেছিলে তুমি হেঁসেছিল সবে, এমন জীবন তুমি করিবে গঠন, মরিলে হাঁসিবে তুমি, কাঁদিবে ভূবন।"

আমাদের দাদু/বাবার অসুস্থতার সময় হাসপাতালে ও মৃত্যুকালীন শেষকৃত্য অনুষ্ঠানে প্রার্থনা, সান্ত্বনা ও বিভিন্নভাবে সাহায্য-সহযোগীতা করেছেন, তাদের প্রতি রইলো আমাদের পরিবারের পক্ষ থেকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। পরম করুণাময় ঈশ্বরের কাছে তার আত্মার চিরকল্যাণ কামনা করি।

তোমার শোকাহত স্ত্রী : সিসিলিয়া রোজারিও
তোমার স্নেহের নাতি-নাতনীরা : ঐশী, যাকব, অর্ধি, অন্তি, অহনা, প্রাপ্তি, কৃপা
অথৈ, অবণী, রাহেল, মার্সিয়া ও ম্যাম
এবং
পুত্র, কন্যা, জামাতা ও পুত্রবধূরা

বিজ্ঞ/১৮৩/২০

Edited & Published by **Fr. Bulbul Augustine Rebeiro,** Christian Communications Centre, 61/1, Subhash Bose Avenue,